banglainternet.com

বেতাল পঞ্চবিংশতি : উপক্রমণিকা

উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্ব সেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল চার রানী ও ছয় পুত্র। রাজপুত্ররা সবাই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। গন্ধর্ব সেন মারা গেলে তাঁর প্রথম পুত্র শঙ্কু সিংহাসনে বসেন। রাজার ছোট ছেলে বিক্রমাদিত্য লেখাপড়ায় নীতিজ্ঞানে ও শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু রাজা হবার জন্যে হঠাৎ তিনি ব্যস্ত হলেন। তিনি বড় ভাই শঙ্কুকে হত্যা করে নিজে রাজা হলেন। ধীরে ধীরে গোটা জম্বুদ্বীপের রাজা হয়ে নিজের নাম চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য মনে মনে ভাবলেন ঈশ্বর আমাকে প্রজাদের ভালমন্দ দেখার ভার দিয়েছেন। কিন্তু আমি তাঁদের প্রতি কোন নজরই দিচ্ছি না। মন্ত্রীদের উপর রাজ্যের ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছি। মন্ত্রীরা আমার প্রজাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছে তা'তো আমি জানি না। আমার কর্তব্য প্রজাদের সুখ সুবিধে দেখা ও তাদের সঙ্গে মন্ত্রীরা কেমন ব্যবহার করছে তা জানা। এইসব ভেবে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর ভাই ভর্তৃহরির হাতে রাজত্বের ভার দিয়ে সন্ন্যাসীর বেশ ধরে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

সেই সময় উজ্জয়িনীবাসী এক গরীব ব্রাহ্মণ কঠোর তপস্যা করছিলেন। দেবতা খুশি হয়ে ব্রাহ্মণকে একটা অমর ফল দেন ও বলেন এই ফল খেলে মানুষ অমর হবে। ব্রাহ্মণ খুশি হয়ে ব্রাহ্মণীকে এই কথা বলে দেন। ব্রাহ্মণী এই অমর ফলের কথা শুনে খুব রেগে যায় ও বলে আমরা গরীব, দু'বেলা খাওয়া জোটে না। আমাদের অমর হয়ে কি লাভ? দিনরাততো অভাবের যন্ত্রণা ভোগ করছি। তার চেয়ে মনে হয় মৃত্যু অনেক ভাল। আর তুমি কেন অমর হতে চাইছ? বউয়ের এইসব কথা শুনে ব্রাহ্মণ বললেন আমি কি বোকা। কোন ভাবনা চিন্তা না করেই এই ফল নিয়েছি। এখন তুমিই বল কি করবো আমি? ব্রাহ্মণী বলল এই ফল তুমি রাজা ভর্তৃহরিকে দিয়ে তার বদলে অর্থ নিয়ে এস, তাহলে আমাদের সংসারের অভাব দূর হবে।

ব্রাহ্মণীর কথামতো ব্রাহ্মণ সোজা রাজার কাছে গিয়ে হাজির হলেন এবং রাজাকে অমর ফলের গুণের কথা বললেন, আর বললেন মহারাজ আপনি ফলের বিনিময়ে আমাকে কিছু অর্থ দিন। তাছাড়া আপনি অমর হলে রাজ্যের মঙ্গল হবে।

রাজা ভর্তৃহরি সব শুনে ফলটি নিলেন ও ব্রাহ্মণকে প্রচুর টাকা দিলেন।

রাজা ভাবলেন আমার এই ফল দিয়ে কি হবে, তার চেয়ে ফলটা রানীকে দেওয়াই ভাল। তিনি রানীর মহলে গিয়ে বললেন, রানী এই ফলটা তুমি খাও তাহলে তুমি অমরত্ব লাভ করবে। রানী খুশি হয়ে ফলটি নিলেন।

এদিকে রানীর প্রিয় পাত্র ছিলেন উজ্জয়িনীর নগরপাল। তাই তিনি অমর ফলটি তার প্রিয় পাত্রের হাতে তুলে দিলেন। এই নগরপালের আবার একজন বীরাঙ্গনা প্রিয়তম ছিল। নগরপাল এই ফলটি বীরাঙ্গনার হাতে তুলে দিলেন।

বীরাঙ্গনা অমর ফলটি হাতে পেয়ে ভাবল, এই ফল খেয়ে অমর হওয়া আমার কাছে খুবই কষ্টকর। তার চেয়ে এই ফলটি রাজাকে দেওয়াই ভাল। রাজা চিরঞ্জীবী হলে প্রজাদের মঙ্গল হবে। এই কথা ভেবে বীরাঙ্গনা ফলটি নিয়ে রাজার কাছে গেল ও বলল—"মহারাজ, এই ফলটি আপনি গ্রহণ করুন। এই ফলটি খেলে মানুষ অমর হয়। এটা আপনারই যোগ্য মহারাজ।"

রাজা ভর্তৃহরি বীরাঙ্গনার হাতে অমর ফলটি দেখে চমকে উঠলেন। রাজা ফলটি নিয়ে তাকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় দিলেন। রাজা ভাবতে লাগলেন—এই ফলটা কি করে বীরাঙ্গনার হাতে পৌঁছল? তিনি ফলটা নিজের হাতে রানীকে দিয়েছিলেন। তার থেকে ওটা কি করে বীরাঙ্গনার হাতে পৌঁছাল? তিনি গোপনে সব কথাই জানতে পারলেন। মনে মনে কষ্ট পেলেন। রাজা মূল কথা জানার জন্যে রানীর মহলে গিয়ে রানীকে জিজ্ঞেস করলেন, রানী, তোমাকে যে ফলটি দিয়েছি তা কি করেছ? রানী বললেন—সে ফলতো আমি খেয়ে ফেলেছি।

মিথ্যে কথা শুনে রাজা খুব রেগে গেলেন এবং ফলটি দেখালেন। রানী আর কিছু বলতে পারলেন না। চুপটি করে রইলেন। রজা ভর্তৃহরি রানী মহল থেকে বেরিয়ে অমর ফলটি নিজে খেলেন ও রাজবেশ ছেড়ে বনে গিয়ে তপস্যায় বসলেন।

এদিকে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন খালি থাকায় দেবরাজ এক যক্ষকে রক্ষী করে উজ্জয়িনী নগরে পাঠালেন। যক্ষ খুব সতর্ক হয়ে নগর রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই রাজা ভর্তৃহরি সব ত্যাগ করে বনে চলে গিয়েছেন এই খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

বিক্রমাদিত্য এই খবর পেয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন। তিনি মাঝরাতে নগরে প্রবেশ করতে গেলে নগর রক্ষক যক্ষ এসে রুখে দাঁড়িয়ে বলল—কে তুই? কোথায় যাচ্ছিস? তোর নাম কি?

রাজা বিক্রমাদিত্য রেগে বললেন—আমি হচ্ছি রাজা বিক্রমাদিত্য, আমি আমার রাজ্যে যাচ্ছি। তুই কে তা বল? আমার পথ কেন আটকাচ্ছিস? যক্ষ বলল, দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে এই নগরের রক্ষক নিযুক্ত করেছেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া তুমি এই নগরে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যদি তুমি সত্যিই রাজা বিক্রমাদিত্য হও তাহলে আগে আমার সাথে যুদ্ধ কর, পরে নগরে ঢুকবে।

এই কথা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য যুদ্ধের জন্যে তৈরি হলেন। যুদ্ধ শুরু হল। চলল প্রচণ্ড যুদ্ধ। রাজা যক্ষকে পরাজিত করলেন।

যক্ষ পরাজিত হয়ে বলল—তোমার ক্ষমতা দেখে বুঝলাম সত্যিই তুমি রাজা বিক্রমাদিত্য। এবার আমাকে ছেড়ে দাও, তার বদলে আমি তোমার প্রাণ বাঁচাব।

রাজা যক্ষের কথায় হেসে বললেন—তুই আমায় প্রাণে বাঁচাবি? আমি ইচ্ছে করলে এখনই তোকে মেরে ফেলতে পারি। যক্ষ সব শুনে বলল—মহারাজ তুমি ইচ্ছে করলে

এখনই আমার প্রাণ নিতে পার কিন্তু আমি তোমাকে সামনের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাব। আমি যা বলছি শোন, আমার কথা শুনলে দীর্ঘজীবী হবে এবং অখণ্ড পৃথিবীতে রাজত্ব করতে পারবে।

রাজা বিক্রমাদিত্য যক্ষের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। তারপর শান্ত মনে তিনি যক্ষের কথা শুনতে লাগলেন।

যক্ষ তার জীবন-কাহিনী বলতে লাগল। ভোগবতী নগরে চন্দ্রভানু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন মৃগয়া করতে বেরিয়ে বনে গিয়ে দেখলেন একজন সাধু মাথা নিচের দিকে ও পা আকাশের দিকে করে ধ্যান করছেন। এই সাধু কারও সঙ্গে কথা বলেন না। বহুকাল ধরে উনি এইভাবে ধ্যান করছেন। রাজা সন্ন্যাসীর এই কঠিন ব্রত দেখে খুব অবাক হয়ে নগরে ফিরে এলেন। পরের দিন রাজসভায় বসে সভাসদদের বললেন—আমি একজন অদ্ভুত সাধুকে দেখেছি। যদি কেউ এই সাধুকে রাজধানীতে আনতে পারে তাহলে তাঁকে আমি লক্ষ মুদ্রা উপহার দেব। এই খবর সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল। খবর শুনে একটি সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে রাজার সামনে এসে বলল—মহারাজ আপনি আদেশ দিলে আমি এই সাধুকে বিয়ে করে পুত্র সন্তানের মা হয়ে, সেই পুত্রকে তার কাঁধে চাপিয়ে আপনার রাজসভায় নিয়ে আসতে পারি। মেয়েটির কথা শুনে রাজা চমকে উঠলেন এবং তাকে তাই করতে আদেশ দিলেন।

মেয়েটি রাজার আদেশ পেয়ে সাধুর আশ্রমে গিয়ে দেখেন সাধু মাথা নিচের দিকে এবং পা উপরের দিকে তুলে একটা গাছের ডালে ঝুলে আছেন। সাধু কোন কথা বলেন না। মেয়েটি সাধুর আশ্রমের পাশে একখানা কুটির তৈরি করে থাকতে লাগল, আর রোজ সাধুকে মোহনভোগ এনে খাওয়াতে লাগল। সাধু রোজ মোহনভোগ খেয়ে শরীরে একটু বল পেলেন। গাছ থেকে নেমে বীরাঙ্গনাকে জিজ্ঞেস করলেন—কে তুমি? এই নির্জন বনে কেন এসেছ?

মেয়েটি বলল—আমি দেবকন্যা, দেবলোকে তপস্যা করি। আমি তীর্থ করতে এসে এই ভারতবর্ষে এসেছি। এখানে কুটির তৈরি করে রয়েছি। আপনার এই আশ্রমে এসে আপনার সেবা করে ধন্য হলাম।

সাধু বললেন—তোমার ব্যবহার ও তোমার মিষ্টি রূপ দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে। তোমার কুটিরে আমাকে নিয়ে চল।

মেয়েটি সাধুকে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। সেখানে তাঁকে যত্ন করে অনেক কিছু খাওয়াল। এইভাবে মেয়েটিকে সাধুর ভাল লাগল। বিয়েও করলেন। সাধু তাঁর তপস্যা ছেড়ে এই মেয়েটির সঙ্গে দিন কাটাতে লাগলেন। বছর খানেক পর তাদের একটি ছেলে হল।

কিছুদিন পর মেয়েটি সাধুকে বলল—প্রভু অনেক দিনতো হল আমরা এখানে কাটাচ্ছি, এবার চলুন তীর্থ করে বেড়াই।

সাধু মেয়েটির কথায় রাজী হলেন। মেয়েটি তাদের ছেলেকে সাধুর কাঁধে চাপিয়ে চন্দ্রভানুর রাজধানীতে এলো। রাজসভায় উপস্থিত হওয়ামাত্র রাজা মেয়েটিকে চিনতে পারলেন আর সাধুর কাঁধে ছেলে দেখে সবাইকে বললেন দেখ এই মেয়েটি তার প্রতিজ্ঞা রেখেছে। সভায় সবাই বলল, হ্যাঁ মহারাজ এই সেই মেয়েটি।

banglainternet.com

সবার কথা শুনে সাধু সব বুঝতে পারলেন এবং তার সব মোহ কেটে গেল। আগের সব কথা মনে পড়ে গেলে, রাগে ক্ষোভে জ্বলতে লাগলেন। বুঝলেন এই রাজা ঐশ্বর্যের অহংকারে ধর্মজ্ঞান হারিয়ে ছলনা করে তাঁর সাধনা ভঙ্গ করেছে।—নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে সাধু কাঁধ থেকে ছেলেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওখান থেকে একটা বনে গিয়ে ফের ধ্যানে বসলেন। কিছুদিন পর সাধু চন্দ্রভানুকে কৌশলে হত্যা করলেন।

এতখানি বলে যক্ষ বলল—মহারাজ আপনি, রাজা চন্দ্রভানু আর ঐ সাধু আপনারা তিনজনে এক নগরে এক নক্ষত্রে ও এক লগ্নে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আপনি রাজবংশে জন্মে এই পৃথিবীতে রাজত্ব করছেন, চন্দ্রভানু তেলীর ঘরে জন্মে ভোগবতী রাজ্যের রাজা হয়েছে, আর সাধু কুমোরের ঘরে জন্মে যোগসাধনা করে ক্ষমতা অর্জন করেছে। এই সাধু চন্দ্রভানুকে হত্যা করে তাঁকে 'বেতাল' করে শ্মশানের কাছে এক শিরীষ গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে। সাধু এখন আপনাকে হত্যা করার চেষ্টায় আছে। এটা সফল হলেই তাঁর প্রতিজ্ঞা শেষ হবে। এখন কথা হল যদি আপনি ওই যোগীর হাত থেকে রেহাই পান, তাহলে আপনি বহুদিন বিনা বাধায় রাজত্ব করতে পারবেন। যক্ষ তারপর বলল—আপনাকে আমি সব জানিয়ে দিলাম। এবার থেকে আপনি সাবধান হোন। এই বলে যক্ষ তার নিজের জায়গায় চলে গেল।

এইসব কথা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য মনে মনে একটু ভীত হয়ে নানা কথা চিন্তা করতে করতে রাজপ্রাসাদে গেলেন। পরদিন সকালে রাজসভায় গিয়ে সিংহাসনে বসলেন। সভাসদ, প্রজারা সবাই এতদিন পর রাজাকে দেখে খুব আনন্দ পেল। রাজা বিক্রমাদিত্যও মনের সুখে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করতে লাগলেন।

একদিন শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী রাজসভায় এলেন। রাজাকে আশীর্বাদ করে একটি ফল দিলেন। রাজার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে একসময় তিনি চলে গেলেন। সন্ন্যাসী চলে যাবার পর রাজা মনে মনে ভাবলেন যক্ষ যে সাধুর কথা বলেছিল, এ সেই সাধু কি? তাহলে তো ফলটি খাওয়া উচিত হবে না। এই ভেবে রাজা ফলটি কোষাধ্যক্ষের হাতে দিয়ে বললেন—এটি রেখে দাও। সন্ন্যাসী রোজই রাজাকে আশীর্বাদ করে একটি করে ফল দিয়ে যেতে লাগলেন। রাজাও ফলগুলো কোষাধ্যক্ষের হাতে তুলে দিতেন। একদিন সন্ন্যাসীর হাত থেকে ফলটি নিতে গিয়ে রাজার হাত থেকে ফলটি মাটিতে পড়ে ফেটে গেল আর তা থেকে একটা অপূর্ব রত্ন বের হল। রাজা এই রত্নটি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। রাজা সাধুকে জিজ্ঞেস করলেন প্রভু আপনি কি জন্যে এই রত্নগর্ভ ফল আমাকে দিলেন।

সাধু বললেন মহারাজ শাস্ত্রে আছে রাজা, গুরু, জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসকের কাছে কখনও খালি হাতে যেতে নেই। যার জন্যে আমি এই ফলটি এনেছি। শুধুমাত্র এই ফলটির মধ্যেই যে রত্ন আছে তা নয়, আপনাকে এতদিন যত ফল দিয়েছি সবগুলোর মধ্যেই একটি করে এমন রত্ন ছিল।

এই কথা শুনে রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডেকে অন্য ফলগুলো আনতে বললেন। তারপর সব ফল ভেঙ্গে একটি করে রত্ন পেলেন। অনেকগুলো দামী রত্ন পেয়ে রাজা খুব খুশি হলেন। তিনি মনিকারদের ডেকে রত্নগুলো দিয়ে বললেন—প্রত্যেকটি রত্নের মূল্য কত হবে ঠিক করে বলে দাও।

মনিকার সব রত্ন পরীক্ষা করে বলল—মহারাজ এই সব রত্ন খুব দামী আর মূল্যবান। প্রত্যেকটির মূল্যই কোটি কোটি টাকা। এসবই অমূল্য রত্ন।

রাজা মনিকারকে অনেক উপহার দিয়ে বিদায় করলেন। তারপর সন্ন্যাসীকে তাঁর সিংহাসনে বসিয়ে বললেন, প্রভু আপনি যে রত্নগুলো আমাকে দিয়েছেন তার দাম আমার এই সাম্রাজ্যের থেকে অনেক বেশি। আমার জানতে ইচ্ছে করছে আপনি সন্ন্যাসী হয়ে এইসব অমূল্য রতন কোথা থেকে পেলেন? তাছাড়া এইসব রত্ন আপনি আমাকে কেন দিয়েছেন?

সন্ন্যাসী বললেন—মহারাজ একটা কথা আছে ঔষধ আর মন্ত্র সবার সামনে বলা উচিত নয়। যদি অনুমতি দেন তাহলে নির্জনে গিয়ে বলতে পারি, তাছাড়া নীতিবিদরা বলেন মন্ত্র অন্য কানে গেলে তা অপ্রকাশিত থাকে না, বরং কাজের ক্ষতি হয়। চারজন জানতে পারলে জানাজানি হয় কিন্তু কার্য সিদ্ধি হয় না। আর দুইজনের কথা মানুষ দূরে থাক স্বয়ং ব্রহ্মাও জানতে পারে না।

এই কথা শুনে রাজা সন্ন্যাসীকে নিয়ে নির্জনে গেলেন আর বললেন—প্রভু আপনি আমাকে এত রত্ন দিলেন কিন্তু একদিনও আমার গৃহে খেলেন না। এতে আমি খুবই লজ্জিত। প্রভু আপনার যদি আমাকে দিয়ে কোন উপকার হয় তাহলে আমাকে বলুন। আমি প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব।

সন্ন্যাসী বললেন মহারাজ গোদাবরীর তীরে এক শ্মশানে আমি মন্ত্রসিদ্ধ করব বলে ঠিক করেছি। এটা করতে পারলে আমি অনেক ক্ষমতা লাভ করবো। আমার ইচ্ছে আপনি একদিন সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত আমার কাছে থাকবেন। আপনি কাছে থাকলে আমার মন্ত্রসিদ্ধ হবে।

রাজা বললেন, বলুন প্রভু কবে যেতে হবে? আমি সেদিনই যাব।

সন্ন্যাসী বললেন আপনি আগামী ভাদ্রকৃষ্ণাচতুর্দশীতে সন্ধ্যা বেলায় একা আমার কাছে যাবেন। তাহলেই আমার মন্ত্রসিদ্ধ হবে। রাজা বললেন—হে যোগীশ্বর আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি ঠিক সময়ে আপনার আশ্রমে পৌছে যাব। রাজার কাছ থেকে কথা আদায় করে সন্ন্যাসী আশ্রমে ফিরে গেলেন। সন্ন্যাসী কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন শ্মশানে ধ্যানে বসলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য ঠিক সময়ে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে হাজির হলেন। দেখলেন ভূত-প্রেত, পিশাচ শঙ্কিনী, ডাকিনীরা সব সন্ন্যাসীর চারদিকে নৃত্য করছে। সন্ন্যাসী যোগাসনে বসে দুই হাতে দুটো মাথার খুলি নিয়ে বাজাচ্ছেন। রাজা বিক্রমাদিত্য কিন্তু এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে মোটেই ভয় পেলেন না। বরং হাত জোড় করে বললেন—প্রভু আমি এসেছি, এবার আপনি আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী বললেন মহারাজ আমি আপনার কথায় খুব খুশি হয়েছি। সৎলোকেরা প্রাণ দিয়েও প্রতিজ্ঞা পালন করে। এখান থেকে দুই ক্রোশ দূরে দক্ষিণে একটা শ্মশান আছে। সেখানে একটা শিরীষ গাছে মড়া ঝুলছে। ওই মড়া আমার কাছে নিয়ে আসুন। রাজাকে এই আদেশ দিয়ে সন্ন্যাসী ফের যোগাসনে বসলেন।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। মুসলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ভূত-প্রেতরা সব চীৎকার করছে। এই রকম পরিবেশেও রাজা ভয় পেলেন না। তিনি ঠিক শ্মশানে গিয়ে পৌছলেন। সেকি

banglainternet.com

ভয়ঙ্কর শ্মশান। ভূতেরা সব জীবন্ত মানুষ ধরে খাচ্ছে। ডাকিনীরা শিশুগুলোকে চিবিয়ে খাচ্ছে। শিরীষ গাছের শিকড় থেকে পাতা-ডাল পর্যন্ত জ্বলছে। আর চারিদিক থেকে ভয়ঙ্কর আওয়াজ। বিক্রমাদিত্য শিরীষ গাছের কাছে গিয়ে দেখেন একটা মড়া দড়ি বেঁধে গাছে ঝুলানো আছে। তার মাথাটা নিচের দিকে ঝুলছে আর পা দুটো আকাশের দিকে। এই শবটাকে দেখে রাজা বুঝতে পারলেন যক্ষ যে রাজা চন্দ্রভানুর কথা বলেছিল, এটা তারই শব। রাজা গাছে উঠে কোমর থেকে তলোয়ার বের করে শবের পায়ের দড়ি কেটে দিলেন। শবটা নীচে পড়েই চীৎকার করে কাঁদতে লাগল, রাজা এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি গাছ থেকে এসে জিজ্ঞেস করলেন—কে তুমি? কি করে তোমার এমন হল?

এই কথা শুনে শবটা খিলখিল করে হাসতে লাগল। তারপর সুড়সুড় করে গাছে উঠে আগের মতো ঝুলে রইল। বিক্রমাদিত্য আবার গাছে উঠে দড়ি কেটে শবটাকে নিচে নামিয়ে বললেন কি করে তোমার এমন হল বল? শবটা কোন উত্তরই দিল না। রাজা বুঝতে পারলেন যক্ষ এই তেলী রাজা চন্দ্রভানুর কথা বলেছিল। আর সন্ন্যাসী হচ্ছে কুমোর—যে নিজের যোগসিদ্ধির জন্যে চন্দ্রভানুকে শ্মশানে এইভাবে রেখে দিয়েছে। তখন তিনি নিজের গায়ের চাদরে শবটাকে জড়িয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে চললেন সন্ন্যাসীর কাছে। সবে পা বাড়িয়েছে এমন সময় শবটা বলে উঠল, মানে বেতাল বলল—তুমি কে হে বীরপুরুষ? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

বিক্রমাদিত্য বললেন আমি রাজা বিক্রমাদিত্য, শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসীর আদেশমত তোমাকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যাচ্ছি। বেতাল বলল—মহারাজ মূর্খরা, বোকারা আর কুঁড়েরা সব মুখ বুঁজে পথ চলে, আর যাদের জ্ঞানবুদ্ধি আছে তারা নানা রকম ভাল কাজ করতে করতে ও ভাল কথা বলতে বলতে রাস্তা পার হয়। এবার আমি তোমাকে কয়েকটা গল্প বলব। প্রত্যেক গল্প শেষ করে একটা করে প্রশ্ন করব। যদি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পার তাহলে আমি আবার গাছে ফিরে যাব। আর যদি না পার মানে ভুল উত্তর দাও তাহলে তোমাকে মরতে হবে। রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন ঠিক আছে—তাই হবে। এই বলে রাজা মড়াকে কাঁধে করে সন্ন্যাসীর আশ্রমের দিকে এগোতে লাগলেন আর বেতাল তার প্রথম গল্প বলতে লাগল।

banglainternet.com

প্রথম গল্প

পদ্মাবতী ও বজ্রমুকুট

বহু যুগ আগে বারাণসী রাজ্যে প্রতাপমুকুট নামে এক রাজা ছিলেন। রাজার এক রানী ও বজ্রমুকুট নামে এক ছেলে ছিল। বজ্রমুকুট ছিল রাজা-রানীর চোখের মণি, রাজপুত্রকে তাঁরা খুব ভালবাসতেন। একদিন রাজপুত্র বজ্রমুকুট তার বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকে নিয়ে শিকারে বের হলেন। রাজপুত্র একলা একটা গভীর বনে ঢুকে পড়লেন। এই গভীর বনে একটা সরোবর ছিল। রাজকুমার সেখানে পৌঁছে দেখলেন সরোবরে হাঁস ও বক ঘুরে বেড়াচ্ছে, মৌমাছিরা ফুলের মধু খাচ্ছে, চারদিকে কত সুন্দর—গাছপালা, ফল-ফুলে সব সাজানো। কোকিল ও অন্যসব পাখি গান গাইছে। এইরকম সুন্দর পরিবেশে ঘুম এসে যায়। রাজকুমার ঘোড়াকে একটা গাছে বেঁধে রেখে নিজে সরোবরে স্নান করলেন। শিবমন্দিরে গিয়ে পুজো করলেন, তারপর মন্দির থেকে বেড়িয়ে এলেন।

সেই সময় এক রাজকন্যা তার সাথীদের সঙ্গে সরোবরে এলেন। সরোবরে স্নান করে মন্দিরে পুজো সেরে তারা গাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এই সময় রাজকুমার রাজকন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ওদিকে রাজকুমারীও রাজকুমারকে দেখে মুগ্ধ হলেন। রাজকুমারকে দেখিয়ে নিজের খোঁপা থেকে একটা পদ্মফুল খুলে হাতে নিয়ে তারপর সেটা কানে ছোঁয়ালেন, আবার সেটা দাঁতে কাটলেন। তারপর মাটিতে ফেলে দিলেন। যাবার সময় ফুলটি কুড়িয়ে নিজের বুকে রাখলেন আর রাজকুমারের দিকে তাকিয়ে সখীদের সঙ্গে চলে গেলেন।

রাজকুমার এইসব ইঙ্গিতের কোন মানেই বুঝতে পারলেন না। তবে রাজকুমারীকে তার খুব ভাল লেগেছে। বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকে তিনি সব কথাই খুলে বললেন। এদিকে রাজকুমারের মন ভাল নেই, সবসময়ই রাজকন্যার কথা ভাবেন। খাওয়া-দাওয়া, কাজ-কর্ম, আমোদ-প্রমোদ কোন কিছুতেই মন লাগে না। রাজকন্যার একটা ছবি এঁকে, তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। রাজকুমারের এই অবস্থা দেখে মন্ত্রীপুত্র বলল—একি অবস্থা হয়েছে বন্ধু? রাজকুমার বললেন—আমি প্রতিজ্ঞা করেছি ওই রাজকন্যাকে বিয়ে করবো। ওকে বিয়ে করতে না পারলে আমি প্রাণ ত্যাগ করব। মন্ত্রীপুত্র খুবই ভাবনায় পড়লেন; বললেন, রাজকুমারী তোমার সঙ্গে কোন কথা বলছেন?

বজ্রমুকুট বললেন, আমার সঙ্গে রাজকুমারী কোনো কথাই বলেননি। তবে পদ্মফুল দিয়ে ইঙ্গিত করেছেন। রাজকুমার পদ্মফুলের সব কথাই বন্ধুর কাছে খুলে বললেন। সব

শুনে মন্ত্রীপুত্র বলল—তাহলে তো সবই বোঝা গেল, রাজকুমার অস্থির হয়ে বললেন, কি করে বুঝলে আমাকে সব বুঝিয়ে বল। আমি যে আর ধৈর্য রাখতে পারছি না।

মন্ত্রীপুত্র বলল রাজকুমারী মাথা থেকে পদ্মফুল নিয়ে কানে পরেছেন। তার মানে হচ্ছে তিনি কর্ণাট নগরে থাকেন। দাঁতে ফুল কাটার মানে উনি দন্তকাট রাজার মেয়ে। মাটিতে ফুল ছুঁড়ে ফেলার মানে নাম পদ্মাবতী। আর ফুল বুকে তুলে নেওয়া মানে উনি তোমাকে বিয়ে করতে চান।

এইসব শুনে রাজকুমারের মনে খুব আনন্দ হল। তখন দুই বন্ধুতে মিলে রাজপোষাক পরে, সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে কর্ণাট নগরের দিকে রওনা হলেন।

কর্ণাটে পৌছে ওরা দেখতে পেলেন রাজ বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট কুড়েঘরে একজন বুড়ি বসে আছে। ওঁরা বুড়ির কাছে গিয়ে বলল, মা, এখানে আমরা ব্যবসা করতে এসেছি, একটু থাকবার জায়গা হবে?

বুড়ি ওদের দেখে এবং কথা শুনে খুব খুশি হলেন। তাই বললেন, হ্যাঁ বাবা তোমাদের যতদিন ইচ্ছে থাক, আমার কোন আপত্তি নেই। বুড়ির কথা শুনে দুই বন্ধু কুঁড়েঘরে ঢুকল ও বুড়ির সঙ্গে গল্প করতে লাগল। মন্ত্রীপুত্র বলল—মা এই বাড়িতে কয়জন থাকে? তোমার সংসার কি করে চলে? তখন বুড়ি বলল, আমার ছেলে রাজবাড়িতে কাজকর্ম করে আর রাজামশায় আমার ছেলেকে খুব ভালবাসেন। রাজকন্যা পদ্মাবতীর আমি দাইমা ছিলাম। এখন বুড়ি হয়েছি তাই বাড়িতেই থাকি। রাজামশাই আমার খাওয়া পরার খরচ দেন। রোজ আমি রাজপ্রাসাদে রাজকন্যাকে দেখতে যাই।

এই কথা শুনে রাজকুমার বললেন, বুড়িমা, তুমি কাল গিয়ে রাজকুমারীকে বলবে, শুক্লাপঞ্চমীতে সরোবরের তীরে যে রাজকুমারকে দেখেছিলে সে তাঁর সংকেত বুঝে এখানে এসেছে।

এই কথা শুনে বুড়ি লাঠি হাতে নিয়ে দৌড়ে রাজবাড়ির দিকে রওনা হল, গিয়ে দেখে রাজকন্যা একা বসে কি সব ভাবছেন। বুড়ি রাজকন্যার কাছে বসে বলল—রাজকুমারী, তোমাকে ছোট থেকে মানুষ করেছি। এবার তুমি বিয়ে কর। শুক্লা পঞ্চমীতে সরোবরের নিকটে যে রাজপুত্রকে দেখেছিলে, তিনি এখন আমার বাড়িতে আছেন। আমাকে দিয়ে তিনি তোমার কাছে খবর পাঠিয়েছেন। এই রাজকুমার রূপেগুণে অতুলনীয়, তোমার যোগ্য পাত্র। এই কথা শুনে রাজকন্যা রেগে বুড়ির গালে চড় মেরে বললেন, এখনই এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। বুড়ি রেগেমেগে বাড়িতে ফিরে রাজকুমারকে সব কথা খুলে বলল। রাজকুমারের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। মন্ত্রীপুত্র বলল বন্ধু তুমি মন খারাপ কর না। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বুড়িমার গালে দশ আঙ্গুলের ছাপ মানে দশদিন পরে শুক্লপক্ষের শেষে তোমার সঙ্গে দেখা হবে আর চিন্তা করো না। শুক্লপক্ষ এল, বুড়ি আবার রাজকুমারীর কাছে গিয়ে রাজকুমারের কথা বলল, এবার রাজকন্যা বুড়িকে খিড়কী-দরজা দিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন। বুড়ি মনের কষ্টে বাড়িতে গিয়ে রাজকুমারকে সব বলল। রাজকুমার সব শুনে হতাশায় ভেঙে পড়ল। মন্ত্রীপুত্র বলল বন্ধু অত ভেঙে পড়ো না। রাজকুমারী আজ রাতে তোমাকে খিড়কী-দরজা দিয়ে অন্দরমহলে যেতে বলেছেন।

এই কথা শুনে তো রাজকুমারের মনে আনন্দ আর ধরে না। রাতের অপেক্ষায় বসে রইলেন। রাত হতেই রাজকুমার রাজপোষাক পরে নিলেন। মন্ত্রীপুত্র তাঁকে খিড়কী-দরজা পর্যন্ত পৌছে দিল। রাজকুমার ঢুকে দেখলেন রাজকন্যা সেজেগুজে বসে আছেন। ঘরদোর সব সাজানো গুছানো। ওই রাতেই তাঁরা বিয়ে করলেন। মনের সুখে দুইজনে গল্প করলেন। ভোর হবার পর রাজকন্যা রাজকুমারকে কিছুতেই যেতে দিলেন না। রাজকুমারও সেখানেই রয়ে গেলেন। মনের সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। কিছুদিন পর রাজকুমার নিজের দেশে ফিরতে চাইলেন। কিন্তু রাজকুমারী কিছুতেই রাজপুত্রকে ছাড়বেন না। রাজকুমার মনে মনে ভাবতে লাগলেন আমি খুবই অন্যায় করেছি। আমি আমার বাবা মাকে ছেড়ে আছি। আমার প্রিয় বন্ধু তারও কোন খোঁজ-খবর নিচ্ছি না। সবাই নিশ্চয়ই আমাকে স্বার্থপর ভাবছে। রাজকুমারকে এইভাবে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে রাজকন্যা বললেন, কি হয়েছে তোমার?

রাজপুত্র বললেন, আমার বন্ধু মন্ত্রীপুত্র এখানে রয়েছে। প্রায় এক মাস হতে চলল তার কোন খবর জানি না। আমার এই বন্ধুটি খুবই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। সেই তো তোমার সব সংকেতের মানে আমাকে বলে দিয়েছে। বন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা করা উচিত।

সব শুনে রাজকুমারী বললেন, খুবই অন্যায় করেছ তুমি। বন্ধু বলে কথা। আমি অনেক রকম মিষ্টি খাবার তৈরি করে তোমার বন্ধুর কাছে পাঠাচ্ছি। তুমি গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।

রাজকুমার বুড়ির বাড়িতে গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলল, বহুদিন পর বন্ধুকে পেয়ে মন্ত্রীপুত্রের মনে খুবই আনন্দ হল। রাজপুত্র চলে যেতে চাইলে রাজকুমারী মনে মনে ভাবলেন, রাজকুমার বন্ধুর বুদ্ধিতেই আমাকে বিয়ে করেছে। এখন বন্ধুকে গিয়ে সব কথাই বলবে। এইসব কথা আর গোপন থাকবে না। সবাই জেনে যাবে। তার চেয়ে মন্ত্রীপুত্রকে মেরে ফেলাই ভাল। এই ভেবে পদ্মাবতী মিষ্টিতে বিষ মিশিয়ে সখীদের দিয়ে বুড়ির বাড়িতে পৌছে দিলেন। মন্ত্রীপুত্র এত মিষ্টি দেখে অবাক হয়ে বলল, এত মিষ্টি কেন?

রাজকুমার বললেন আজ তোমার কথা ভাবছিলাম বন্ধু। পদ্মাবতীর কাছে তোমার কথা বলেছি। তোমার কথা শুনে পদ্মাবতী খুব খুশি হয়েছেন। তাই বলেছে তুমি বন্ধুর কাছে যাও, আমি নিজের হাতে মিষ্টি তৈরি করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বন্ধু তুমি আমার সামনে বসে মিষ্টি খাও, তাহলে আমি খুশি হব। রাজপ্রাসাদে গিয়ে বলব, তুমি রাজকুমারীর প্রশংসা করেছ, এতে রাজকুমারীও খুব খুশি হবে।

মন্ত্রীপুত্র সব শুনে দুঃখের সঙ্গে বলল এই মিষ্টিতে বিষ আছে বন্ধু, যে খাবে সেই মরে যাবে। তুমি যে খাওনি ভাগ্য ভাল। তুমি খুবই সহজ সরল বন্ধু, তুমি এসব জান না। জানতো রাজকুমারীরা রাজকুমারের প্রিয় পাত্রকে দু'চোখে দেখতে পারে না। তোমার উচিত হয়নি আমার কথা ওকে বলা।

রাজকুমার এই কথা শুনে বললেন, বন্ধু আমি একথা বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি জান না রাজকুমারী কত ভাল মনের। আমাকে কত ভালবাসেন। ঠিক আছে আমি

banglainternet.com

পরীক্ষা করতে চাই। এই বলে রাজকুমার একটা মিষ্টি বুড়িমার পোষা বিড়ালকে দিলেন। বিড়ালটি মিষ্টিটা খেয়ে সাথে সাথে মারা গেল। এই দৃশ্য দেখে রাজকুমার মনে ভীষণ কষ্ট পেলেন, বললেন আমি আর ওই রাজকুমারীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবো না।

মন্ত্রীপুত্র বলল, না বন্ধু তুমি তাকে ত্যাগ করো না। তাকে কৌশলে রাজধানীতে নিয়ে যেতে হবে। আমি যেমনটি বলি তুমি তেমনটি কর। তুমি পদ্মাবতীকে গিয়ে বল, যে মিষ্টি পাঠিয়েছ তা খেয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তাকে আর কিছুই বলবে না। তারপর আজ রাতে যখন রাজকুমারী ঘুমিয়ে পড়বে তখন তার গা থেকে সমস্ত গয়না খুলে নিয়ে একটা পুঁটলি বেঁধে নেবে। তারপর তার বাঁ পায়ে একটা ত্রিশূলের চিহ্ন এঁকে দিয়ে চলে আসবে।

পরদিন রাজকুমার, মন্ত্রীপুত্রের কথামতো সব করে বুড়িমার ঘরে ফিরে এল। মন্ত্রীপুত্রক এক সন্ন্যাসী সেজে শ্মশানে গেল আর রাজপুত্রকে শিষ্য করে বলল, তুমি এই গয়নাগুলো রাজবাড়ির কাছে কোন স্বর্ণকারের নিকট বিক্রি কর। যদি কেউ রাজকুমারীর গয়না চিনে তোমাকে চোর বলে তাহলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।

রাজকুমার স্বর্ণকারের কাছে গয়না বিক্রি করতে গেলেন। স্বর্ণকার এইসব গয়না দেখে চমকে উঠে বলল, এই গয়নাগুলো কিছুদিন আগে রাজকুমারীকে আমি তৈরি করে দিয়েছি। এই গয়না তোমার হাতে এল কি করে? রাজকুমারকে স্বর্ণকার চোর ভাবতে লাগল। এদিকে ভীড় জমে উঠল। নগররক্ষক এসে রাজকুমার আর স্বর্ণকারকে বন্দি করল। রাজকুমার বললেন এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না, আমার গুরুদেব সব জানেন। তিনি শ্মশানে আছেন। তিনি আমায় এসব বিক্রি করতে দিয়েছেন। চলুন তাঁর কাছে, তাহলে সব জানতে পারবেন।

নগররক্ষক শ্মশানে গিয়ে সন্ন্যাসীবেশী মন্ত্রীপুত্র ও শিষ্য রাজপুত্রকে ধরে বন্দি করে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন। রাজা পদ্মাবতীর গয়না দেখে ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীকে নির্জনে নিয়ে গিয়ে বললেন, এসব তুমি কোথায় পেয়েছ?

মন্ত্রীপুত্র বলল, আমি একদিন কৃষ্ণাচতুদর্শীর রাতে নগরের শেষ প্রান্তে শ্মশানে বসে ডাকিনী মন্ত্র সিদ্ধ করছিলাম। সেই মন্ত্রের প্রভাবে এক ডাকিনী এসে তার গা থেকে সমস্ত গয়না খুলে আমাকে দিয়ে গেছে, আমি ওর বাঁ পায়ে যোগসিদ্ধির প্রমাণ হিসেবে ত্রিশূলের চিহ্ন এঁকে দিয়েছি। এইসব তারই গয়না মহারাজ।

রাজা সঙ্গে সঙ্গে অন্দরমহলে লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিলেন রাজকুমারী পদ্মাবতীর পায়ে কোন ত্রিশূলের চিহ্ন আছে কিনা? রানী এসে বললেন হ্যাঁ পদ্মবতীর পায়ে ত্রিশূল আঁকা আছে। এই কথাশুনে রাজামশাই ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। বললেন এই মেয়েকে রাজবাড়িতে রাখা উচিত নয়। ওকে এখনই বনবাসে পাঠানো উচিত। এই মেয়ে থাকলে রাজ্যের অমঙ্গল হবে। রাজার আদেশে পদ্মাবতীকে পাল্কী করে গভীর বনে রেখে আসা হল।

ওদিকে মন্ত্রীপুত্র রাজপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে রাজকুমারীর খোঁজে বের হল। ওরা দেখল রাজকুমারী পদ্মাবতী একটা গাছের তলায় বসে কাঁদছে। রাজকুমার অনেক বুঝিয়ে রাজকন্যাকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিজের দেশে রওনা দিলেন।

রাজা ও রানী এতদিন পর ছেলেকে ও ছেলের বউকে দেখে খুব খুশি হলেন। তারপর তারা সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করতে লাগলেন।

এই গল্প বলে বেতাল বলল—মহারাজ, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। এই গল্পে পদ্মাবতী, তাঁর পিতা দন্তকাট ও মন্ত্রীপুত্র এদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি অপরাধী? বিক্রমাদিত্য বললেন রাজা দন্তকাট এই গল্পে সবচেয়ে বেশি অপরাধী।

বেতাল বলল কেন?

বিক্রমাদিত্য বললেন শত্রুকে মারা কোন দোষের নয়। পদ্মাবতী মন্ত্রীপুত্রকে শত্রুকে ভেবে মেরে ফেলতে চেয়েছেন। আর মন্ত্রীপুত্র পদ্মাবতীকে শত্রু ভেবেছে তাই তাঁর সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন। কিন্তু রাজা দন্তকাট সঠিক বিচার করেননি। তিনি পিতা হয়ে মেয়ের দোষ বিচার না করেই তাকে বনবাসে দিলেন। এ কারণেই তিনি বেশি অপরাধ করেছেন।

এই কথা শুনে বেতাল আবার শ্মশানে গিয়ে আগের মত গাছে ঝুলে রইল। বিক্রমাদিত্য তার পিছন পিছন গিয়ে তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে তুলে ফের রওনা দিলেন। বেতাল এবার তার দ্বিতীয় গল্প শুরু করল।

banglainternet.com

দ্বিতীয় গল্প

মধুমালতী ও মধুসূদন

এক সময় যমুনা নদীর তীরে জয়স্থল নামে একটা গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে কেশবশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ওই ব্রাহ্মণের এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। মেয়ের নাম মধুমালতী। মেয়েটি ছিল অপূর্ব সুন্দরী। দেখতে দেখতে মধুমালতী বড় হয়ে উঠল। ক্রমে মধুমালতীর বিয়ের বয়স হলে ব্রাহ্মণ ও তাঁর ছেলে চারদিকে ভাল পাত্রের খোঁজ করতে লাগলেন।

একদিন ব্রাহ্মণ তাঁর যজমানের ছেলের বিয়েতে গ্রামে গেছেন। ওদিকে তার পুত্রও পড়াশুনার জন্যে গুরুবাড়িতে গেছে। সেই সময় ত্রিবিক্রম নামে একটি ব্রাহ্মণের ছেলে কেশবশর্মার বাড়িতে এল। বাড়িতে কেশবশর্মার বউ আর মেয়ে মধুমালতী ছাড়া কেউ নেই। ছেলেটিকে কেশবশর্মার স্ত্রীর খুব ভাল লাগল। যেমন দেখতে শুনতে ভাল তেমনি ব্যবহারটাও খুব মিষ্টি। তাছাড়া বংশ-পরিচয়ও খুব ভাল। ব্রাহ্মণী মনে মনে ভাবলেন এই ছেলের সঙ্গে যদি মধুমালতীর বিয়ে হয় তাহলে খুবই ভাল হবে। তাই তিনি বলে ফেললেন তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। তোমার সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেব। ব্রাহ্মণীর কথা শুনে ত্রিবিক্রম মনে মনে খুশি হয়ে মধুমালতীকে বিয়ে করতে রাজী হলো। এখন ব্রাহ্মণ ফিরলেই সম্বন্ধটা পাকা হয়।

বেশ কিছুদিন পর ব্রাহ্মণ ও তাঁর ছেলে দুই জন পাত্রকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরলেন। এই দুইজনের নাম বামন আর মধুসূদন। তিন পাত্রকে নিয়ে কেশবশর্মা খুবই চিন্তায় পড়লেন। কারণ তিনটে পাত্রই রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে সমান। কাকে ছেড়ে কার সঙ্গে বিয়ে দেবেন। তাই পাত্র-নির্বাচনে খুবই সমস্যায় পড়লেন ব্রাহ্মণ।

এদিকে ঘটনাটা ঘটে গেল অন্যরকম। মধুমালতীকে সাপে কাটে, অনেক বৈদ্যওঝা এসেও মধুমালতীকে বাঁচাতে পারল না। মধুমালতী মারা গেল। সবাই শোকে দুঃখে ভেঙে পড়ল। ব্রাহ্মণ ও তাঁর ছেলে আর তিন পাত্র মিলে মৃতদেহটি শ্মশানে নিয়ে গেল ও পুড়িয়ে ফেলল। ব্রাহ্মণ ও তাঁর ছেলে বাড়ি ফিরে গেলেন। আর তিন পাত্রের মধ্যে ত্রিবিক্রম চিতা থেকে হাড় কুড়িয়ে কাপড়ে বেঁধে ঘরের কোণে রেখে দেশ ঘুরতে বের হলেন। বামন সন্ন্যাসী হয়ে তীর্থে বের হল, মধুসূদন ওই শ্মশানের এক কোণে কুঁড়েঘর বানিয়ে চিতা থেকে ছাই এনে কুঁড়েঘরে রাখল ও যোগভ্যাস করতে লাগল।

বামন তীর্থে বেরিয়ে একদিন দুপুরবেলা এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গেল। সন্ন্যাসী দেখে ব্রাহ্মণ তাকে খুব আদর যত্ন করে খেতে বসালেন। ব্রাহ্মণী বামনকে খেতে দিতে

লাগলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণের পাঁচ বছরের ছেলেটা খুব দুষ্টুমি করতে লাগল। ব্রাহ্মণী কিছুতেই ছেলেকে বশে আনতে পারলেন না। তাই রেগেমেগে ছেলেকে জ্বলন্ত উনুনে ফেলে দিয়ে খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে বামন ভীষণ রেগে গিয়ে খাওয়া থামিয়ে দিল। তাই দেখে ব্রাহ্মণ বললেন কি হয়েছে? খাচ্ছেন না কেন?

বামন বলল আপনার স্ত্রীর মতো নিষ্ঠুর মা পৃথিবীতে একটাও নেই, এই গৃহে আমি খাব কি করে?

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর কথা শুনে ঘরে গিয়ে সঞ্জীবনী পুঁথি সঙ্গে নিয়ে এলেন। তারপর পুঁথি খুলে একটা মন্ত্র পাঠ করতেই তার ছেলে প্রাণ ফিরে পেল।

এই দৃশ্য দেখে বামন সন্ন্যাসী ভাবল এতো খুব মজার ব্যাপার। এই পুঁথিতেই মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র আছে। এই মন্ত্র জানতে পারলে এখনই মধুমালতী বেঁচে যাবে। বামন সন্ন্যাসী ঠিক করল, যেমন করে হোক এই পুঁথিটা চুরি করতে হবে। তাই বামন ব্রাহ্মণকে বলল এখন তো বেলা অনেক হল। যেতে রাত হয়ে যাবে, ভাবছি রাতটা এখানেই কাটাব।

ব্রাহ্মণ খুশি হয়ে বামনের থাকার জায়গা করে দিলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল, তখন বামন পুঁথি নিয়ে চুপিসারে ব্রাহ্মণের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে জয়স্থল নগরের সেই শ্মশানে গিয়ে হাজির হল। দেখল মধুসূদন বসে যোগভ্যাস করছে আর ত্রিবিক্রমও সেখানে রয়েছে। বামন দুই পাত্রকে বলল "দেখ আমি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিখেছি, তোমরা মধুমালতীর হাড় ও ছাই একসঙ্গে কর। আমি ওকে মন্ত্র পড়ে বাঁচিয়ে তুলব। দুই পাত্র সঙ্গে সঙ্গে হাড় ছাই এক জায়গায় জড়ো করল। বামন পুঁথি খুলে মন্ত্র জপ করতে লাগল। দেখতে দেখতে ছাই আর হাড় সব মিলে মধুমালতী বেঁচে উঠল। জীবন্ত মধুমালতীকে ফিরে পেয়ে পাত্রদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। সবার ইচ্ছে মধুমালতীকে বিয়ে করে।

এতখানি বলে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে বলল, বলুন তো মহারাজ মধুমালতীর সাথে কোন পাত্রের বিয়ে হওয়া উচিত?

বিক্রমাদিত্য বললেন মধুমালতীর সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত মধুসূদনের। কারণ এতদিন ও শ্মশানে বাস করছিল। বেতাল বলল, যদি ত্রিবিক্রম হাড় সংগ্রহ করে না রাখতো আর বামন যদি সঞ্জীবনী মন্ত্রের পুঁথি না সংগ্রহ করতো তাহলে কি মধুমালতী বাঁচতো?

বিক্রমাদিত্য বললেন, ত্রিবিক্রম হাড় সংগ্রহ করে ছেলের কাজ করেছিল, আর বামন তাকে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে পিতার কাজ করেছিল। সুতরাং তাদের সঙ্গে মধুমালতীর বিয়ে হতে পারে না। আর মধুসূদন ছাই সংগ্রহ করে, পাতার কুঁড়ে ঘর বেঁধে শ্মশানেই অপেক্ষা করেছে। সুতরাং তারই সঙ্গে মধুমালতীর বিয়ে হওয়া উচিত।

এই উত্তর শুনে বেতাল শ্মশানে ফিরে গিয়ে আবার আগের মতো ঝুলে রইল। বিক্রমাদিত্য তার পিছনে গিয়ে দড়ি কেটে তাকে কাঁধে নিয়ে ফের সন্ন্যাসীর আশ্রমের দিকে রওনা দিলেন। বেতাল এবার তার তৃতীয় গল্প শুরু করল।

banglainternet.com

তৃতীয় গল্প

বীরবরের আত্মত্যাগ

এক সময় বর্ধমান নগরে রূপসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন পণ্ডিত, ধার্মিক, দয়ালু ও বুদ্ধিমান। একদিন বীরবর নামে এক যোদ্ধা এসে রাজার কাছে কাজ চাইল। রাজা বীরবরকে দেখে ও তার কথাবার্তা শুনে খুশি হয়ে তাকে কাজ দিলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন—কত টাকা তুমি বেতন চাও?

বীরবর বলল—মহারাজ আমাকে রোজ এক হাজার সোনার মোহর দিলেই চলবে।

রাজা বললেন তোমার সংসারে কতজন লোক আছে?

বীরবর বলল মহারাজ আমার স্ত্রী, এক ছেলে আর এক মেয়ে আছে।

রাজা এই কথা শুনে ভাবলেন যার পরিবারে এত কম লোক সে কেন এত টাকা চাইছে। মনে হচ্ছে লোকটার অনেক গুণ আছে। যাক কয়েকটা দিন ওকে রেখে দেখা যাক কি গুণ আছে লোকটার। রাজা তাঁর কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন বীরবরকে প্রতিদিন এক হাজার সোনার মোহর বেতন হিসাবে দিতে।

এদিকে বীরবর রোজই এক হাজার সোনার মোহর নিয়ে বাড়িতে যায়। তবে মোহরের অর্ধেক দান করে বৈষ্ণব, বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদের। বাকী টাকা দিয়ে গরীব দুঃখীদের খাওয়ায় আর যা অল্প বাকি থাকে তাতে নিজের সংসার চালায়। রোজই এই ভাবে সে এক হাজার মোহর খরচ করতো। রাতে অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ পোষাক পরে রাজবাড়ি পাহারা দিত। রাজাও ওর শক্তি ও সাহস পরীক্ষা করার জন্যে মাঝরাতে নানা কাজে পাঠাতেন। আর বীরবর সেই সব সহজেই করে ফিরে আসতো।

একদিন গভীর রাতে রাজা এক স্ত্রীলোকের কান্না শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বীরবরকে ডেকে বললেন তুমি এখনই গিয়ে খোঁজ নিয়ে এস কে কাঁদছে?

বীরবর রাজার আদেশ মতো চলে গেল। এদিকে রাজাও তার সাহস ও শক্তি দেখার জন্যে, পিছন পিছন গেলেন।

বীরবর কান্নার সুর শুনতে শুনতে এক ভয়ঙ্কর শ্মশানে গিয়ে হাজির হল। দেখল একজন সুন্দরী মেয়ে গয়না পরে কপাল চাপড়ে কাঁদছেন। বীরবর তাকে জিজ্ঞেস করল, মা কেন এইভাবে শ্মশানে কাঁদছেন? কি হয়েছে আপনার?

মেয়েটি বলল আমি রাজ্যলক্ষ্মী। রাজা রূপসেনের প্রাসাদে অনেক অন্যায় কাজ হচ্ছে। তাই আমি ওখানে থাকতে পারছি না। আমি চলে গেলেই অলক্ষ্মী আসবে। তখন

রাজার খুব অমঙ্গল হবে। রাজা কিছুদিনের মধ্যে মারাও যাবে। এত ভাল, ধার্মিক দয়ালু রাজা মরে যাবে, এর জন্যেই আমি কাঁদছি।

দেবীর মুখে এইসব শুনে বীরবর ভয়ে কেঁপে উঠল। দেবীর কাছে হাত জোড় করে বলল, মা রাজাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। যদি কোন উপায় থাকে তা আমাকে বলুন, আমি আমার জীবন দিয়ে তা রক্ষা করব?

রাজ্যলক্ষ্মী বললেন, উপায় একটা আছে। তবে সে কাজ তুমি করতে পারবে? এখান থেকে পূর্বদিকে একটা মন্দির আছে। সেই মন্দিরের দেবীর কাছে যদি কেউ তার ছেলেকে নিজের হাতে বলি দেয় তাহলে দেবীর দয়ায় রাজার সব অমঙ্গল কেটে যাবে? এই কঠিন কাজ কে করবে বল?

এই কথা শুনে বীরবর সোজা বাড়িতে গেল। তার পিছন পিছন রাজাও গেলেন। বীরবর বাড়িতে গিয়ে তার বউকে সব কথা খুলে বলল। বউ গিয়ে ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে বলল, বাবা তোমার মাথা কেটে দেবীকে দিলে রাজার সব অমঙ্গল কেটে যাবে ও রাজ্যের উন্নতি হবে।

ছেলে মায়ের কথা শুনে বলল, এতো খুবই ভাল কথা মা। তোমাদের আদেশ মতো কাজ করতে পারছি, বাবার কর্তব্যে সাহায্য করছি। তাছাড়া নিজের এই সামান্য দেহটাকে দেবতাকে দান করছি। এতো আমার সৌভাগ্যের কথা মা।

ছেলের এই কথায় বীরবর মনে আনন্দ পেলেও, মনটা ছেলের জন্যে কেঁদে উঠল। শেষে পুজোর জিনিসপত্র নিয়ে মন্দিরের দিকে রওনা দিল।

রাজা এসবই নিজের চোখে দেখলেন। অবাক হয়ে গেলেন বীরবর ও তার পরিবারের প্রভুভক্তি দেখে। তিনিও ওদের পিছন পিছন চললেন।

বীরবর দেবীকে পুজো করে বলল, হে দেবী, তোমাকে খুশি করার জন্যে আমার ছেলেকে বলি দিলাম। তোমার দয়ায় রাজা যেন দীর্ঘ আয়ু পান।

এই বলে বীরবর খড়্গ দিয়ে নিজের ছেলের মাথা কেটে দেবীর চরণে দান করল।

এই দৃশ্য দেখে বীরবরের মেয়ে খড়্গ নিজের বুকে বসিয়ে দিল। কারণ ও ভাইকে খুবই ভালবাসতো। মেয়েকে ও ছেলেকে হারিয়ে বীরবরের স্ত্রী নিজে আত্মহত্যা করল। বীরবর মনে মনে ভাবল আর আমার বেচে কি লাভ? ছেলে মেয়ে বউ সবাইকে হারালাম আর প্রভুর কাজও শেষ করলাম। এই ভেবে বীরবর খড়্গ দিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেলল।

রাজা আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কিছুই দেখলেন। তিনি ভাবলেন আমার জন্যে ওরা সবাই প্রাণ ত্যাগ করল, আর আমার বেঁচে কি হবে। এই ভেবে তিনিও খড়্গটি তুলে যেই বুকে বসাতে গেলেন, ঠিক তখনই দেবী দুর্গা রাজার হাতটা ধরে বললেন, বৎস তোমার সাহস দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি, তুমি আমার কাছে বর চাও?

রাজা বললেন, মা তুমি যদি সত্যিই আমার উপর খুশি হয়ে থাক, তাহলে এই চারজনকে প্রাণদান কর।

মা দুর্গা তথাস্তু বলে স্বর্গ থেকে অমৃত এনে মৃত চারজনের গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। ওরা চারজনই প্রাণ ফিরে পেল। মনে হল যেন ওরা সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে।

banglainternet.com

রাজা ওদের বেঁচে উঠতে দেখে খুব খুশি হলেন। তিনি দেবীর পায়ে পড়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন।

রাজার ভক্তি দেখে ও স্তব শুনে দেবী খুশি হয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করে ও বর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পরদিন রাজসভায় রাজা সবার সামনে বীরবরের প্রভুভক্তির কথা বললেন এবং প্রভুভক্ত বীরবরকে অর্ধেক রাজ্য দান করলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, এবার বলতো মহারাজ, এদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি মহৎ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার মতে রাজাই বেশি মহৎ। কারণ বীরবর তার কর্তব্য পালন করেছে, তাছাড়া বীরবরের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে প্রাণ দিয়েছে স্বামী ও পিতার জন্যে। এতো সন্তান ও স্ত্রীর কর্তব্য। কিন্তু রাজার তো তেমন কোন ধর্ম নেই। তবুও তিনি তার প্রভুভক্ত প্রজার জন্যে প্রাণ দিতে চেয়েছিলেন।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার শ্মশানে গিয়ে সেই গাছে ঝুলে রইল। বিক্রমাদিত্য দৌড়ে গিয়ে দড়ি কেটে বেতালকে কাঁধে করে হাঁটতে লাগলেন। এবার বেতাল তার চতুর্থ গল্প বলতে শুরু করল।

চতুর্থ গল্প

শুক ও শারি

ভোগবতী নগরে অনঙ্গ সেন নামে এক রাজা ছিলেন। রাজার চূড়ামণি নামে এক শুকপাখি ছিল। এই পাখিটি সব সময়ই রাজার সঙ্গে থাকতো। চূড়ামণি ভবিষ্যৎবাণী করতে পারতো। একদিন রাজা অনঙ্গ সেন চূড়ামণিকে জিজ্ঞেস করলেন, চূড়ামণি তুমি তো অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই বলতে পার, তাহলে বলতো আমার রানী কে হবে ও সে কোথায় থাকে?

চূড়ামণি বলল, মহারাজ মগধদেশের রাজা বীরসেনের কন্যা চন্দ্রাবতীর সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে। রাজা এই কথা শুনে রাজ দৈবজ্ঞ চন্দ্রকান্তকে ডেকে এই বিষয়ে মতামত দিতে বললেন। চন্দ্রকান্ত গণনা করে একই কথা বললেন। রাজা বিয়ের কথা পাকা করার জন্যে এক ব্রাহ্মণকে মগধরাজার কাছে পাঠালেন।

এদিকে রাজকন্যা চন্দ্রাবতীরও মদনমঞ্জরী নামে একটা শারি ছিল। সেও এই চূড়ামণির মতো অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলতে পারতো। একদিন চন্দ্রাবতী মদনমঞ্জরীকে জিজ্ঞেস করলেন বলতো শারি আমার কার সঙ্গে বিয়ে হবে? শারি বলল রাজকুমারী তোমার বিয়ে হবে ভোগবতী নগরের রাজা অনঙ্গ সেনের সঙ্গে।

অনঙ্গ সেনের পাঠানো ব্রাহ্মণ এসে মগধ রাজার কাছে সব কথাই বললেন। রাজা খুশি হয়ে এই প্রস্তাব মেনে নিলেন ও বিয়ের দিন পাকা করার জন্যে অনঙ্গ সেনের কাছে লোক পাঠালেন। খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। রাজা চন্দ্রাবতীকে বিয়ে করে রাজধানীতে নিয়ে এলেন। বেশ সুখে শান্তিতে রাজা-রানীর দিনগুলো কাটতে লাগল।

চন্দ্রাবতী শ্বশুর বাড়িতে আসার সময় তাঁর প্রিয় শারি মদনমঞ্জরীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। একদিন রাজা অনঙ্গ সেন রানীকে বললেন—দেখ, একা একা থাকা খুবই কষ্টকর। তাই আমার ইচ্ছে আমাদের প্রিয় শুক-শারিকে একই খাঁচায় রাখি। একসঙ্গে দুইজনে থাকলে ওরা খুবই সুখী হবে। রাজার ইচ্ছেমতো ওদের একই খাঁচায় রাখা হল।

একদিন দেখা গেল দুই পাখিতে খুব ঝগড়া শুরু হয়েছে। শুক শারিকে বলল, এই পৃথিবীতে যখন জন্মেছ তখন সবই ভোগ করা উচিত। তুমি সব বিষয়ে এত মনমরা কেন?

শুকের কথা শুনে শারি বলল আমি পুরষদের মোটেই পছন্দ করি না, তারা বড় স্বার্থপর এবং অধার্মিক হয়। যার জন্যে পুরুষদের আমার মোটেই ভাল লাগে না। এই

banglainternet.com

কথা শুনে শুক রেগে বলল মেয়েদের কথা আর বলো না, তারাও কম নয়, মেয়েরা খুবই কুটিল। মিথ্যে কথা বলতে পটু, লোভী হয়। এই নিয়ে দুইজনের মধ্যে তুমুল তর্ক চলতে লাগল।

রাজা ওদের তর্ক শুনে বললেন কেন মিছিমিছি তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছ? এইভাবে ঝগড়া করে না।

শারি বলল, মহারাজ আমি যা বলছি তা মোটেই মিথ্যে নয়। আমি জানি পুরুষরা কত বড় অধার্মিক হয়। তাহলে শুনুন ইলাপুরে মহাধল নামে এক ধনী বণিক বাস করতেন। বিয়ের পর তাদের একটাও সন্তান না হওয়ায় বণিকের মনে সুখ ছিল না। তবে বেশি বয়সে ওদের একটি ছেলে হল। তার নাম রাখল নয়নানন্দ। স্বামী-স্ত্রী দুইজনে মিলে ছেলেকে চোখে চোখে রাখতো, খুব-আদর যত্নে রাখতো, বাবা-মা পাঁচ বছর বয়সেই ছেলের জন্যে একজন শিক্ষক রাখল। কিন্তু নয়নানন্দের স্বভাব মোটেই ভাল ছিল না। ছোটবেলা থেকেই সে খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশতো, খারাপ কথা বলতো, পড়াশুনা করতো না। সারাদিন খেলাধুলা করতো। ওর এইসব বদ অভ্যাস দিন দিন বাড়তেই লাগল।

একসময় বণিক মারা গেল। তখন তো নয়নানন্দ প্রচুর অর্থের মালিক। ইচ্ছেমতো বাবার টাকাপয়সা উড়াতে লাগল। এইভাবে টাকা খরচ করতে করতে, শেষে একেবারে ফকির হয়ে গেল। এই অবস্থায় নয়নানন্দ ইলাপুর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। একদিন চন্দ্রপুরে তার বাবার বন্ধু হেমগুপ্তের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল। হেমগুপ্ত বন্ধুর ছেলেকে দেখে খুব খুশি হয়ে তাকে খাতির যত্ন করে বসাল। কেন এসেছে সেই প্রশ্নও করল।

নয়নানন্দের তো মিথ্যে কথা বলার স্বভাব। তাই সে বলল, আমি কয়েকটা জাহাজ নিয়ে সিংহল দ্বীপে বাণিজ্য করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সমুদ্রে ঝড় হওয়ায় আমার সমস্ত জাহাজ ডুবে যায়। ভাগ্য ভাল যে আমি মারা যাইনি। কোনমতে প্রাণে বেঁচে গেছি। এইসব মিথ্যে কথা বলতে বলতে নয়নানন্দ কয়েক ফোঁটা চোখের জলও ফেলল।

ওর এই দুঃখের কথা শুনে বন্ধুর ছেলের জন্যে হেমগুপ্তের খুব মায়া হল। ভাবলেন তার মেয়ে রত্নাবতীর সঙ্গে বিয়ে দেবেন। এত ধনসম্পত্তির মালিক এই রকম পাত্রকে কি হাতছাড়া করা যায়? আর দেরী না করে বিয়েটা দিয়ে দেওয়াই ভাল। এই প্রস্তাবে তার স্ত্রীও রাজী হল। আর নয়নানন্দকে বলতেই সে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। শুভদিন দেখে ওদের বিয়েও হয়ে গেল। বিয়ের পর বেশ সুখেই দিন কাটছিল।

এদিকে নয়নানন্দের আর ভাল লাগে না। এই একঘেঁয়ে জীবনে, সেই বদ অভ্যাসগুলো আবার মনের মধ্যে জেগে উঠতে লাগল। তাই ঠিক করল এখান থেকে চলে যাবে।

একদিন নয়নানন্দ রত্নাবতীকে বলল, দেখ অনেকদিন হল নিজের দেশ ও আত্মীয় স্বজন ছেড়ে এখানে আছি। ভাবছি এবার আমরা দেশে ফিরবো। তুমি তোমার বাবা-মাকে বল আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

হেমগুপ্ত ও তার স্ত্রী এই কথা শুনে খুবই খুশি হলেন। ভাবলেন জামাই আর কতদিন শ্বশুর বাড়িতে থাকবে, নিজের বাড়িতেই তো ফেরা উচিত। জামাইয়ের

বিচারবুদ্ধি দেখে শ্বশুর-শাশুড়ি খুবই খুশি হলেন। যাবার ব্যবস্থা করলেন, মেয়েকে অনেক গয়নাগাটি দিয়ে শ্বশুর বাড়িতে পাঠালেন।

নয়নানন্দ আর রত্নাবতী পথ চলতে লাগল। ওরা একটা গভীর বনের মধ্যে এসে পড়ল। নয়নানন্দ বউকে বলল, দেখ এখানে ডাকাত দস্যুর খুব ভয় আছে। পালকিতে যাওয়া ঠিক নয়। তার চেয়ে গরীবের মতো পথ দিয়ে হেঁটে গেলে কেউ বুঝবে না। তোমার সব গয়না খুলে একটা পুঁটলি বেঁধে আমাকে দাও। শহরে গিয়ে আবার সব পরে নেবে।

রত্নাবতী স্বামীর কথামতো তাই করল। নয়নানন্দ পালকির লোকজনদের সব বিদায় করে দিল। ওরা গভীর বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগল। পথের মাঝে একটা কুয়ো পড়ল। নয়নানন্দ রত্নাবতীকে ধাক্কা মেরে কুয়াতে ফেলে দিয়ে ওর সমস্ত গয়নাগাটি নিয়ে পালিয়ে গেল।

এদিকে রত্নাবতী কুয়োর মধ্যে পড়ে বাবাগো মাগো বলে জোরে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। সেই সময় একজন লোক ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সে কান্না শুনে কুয়োর মধ্যে তাকিয়ে দেখে একটি সুন্দরী বউ কাঁদছে। লোকটি রত্নাবতীকে কুয়ো থেকে তুলে বলল, কি তোমার নাম? এই ভয়ঙ্কর বনের মধ্যে কি করে এলে?

রত্নাবতী কিন্তু স্বামীর বিরুদ্ধে কোন কথাই বলল না। শুধু নিজের বাড়ির কথা বলল। আর বলল আমি আমার স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দস্যুরা আমার সব গয়না নিয়ে আমাকে কুয়োর মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। আর আমার স্বামীকে মারতে মারতে নিয়ে গেছে।

রত্নাবতীর দুঃখের কথা শুনে লোকটার মনে খুব কষ্ট হল। সে রত্নাবতীকে তার বাবা মার কাছে পৌঁছে দিল।

এদিকে নয়নানন্দ দেশে ফিরে বউয়ের গয়নাগাটি সব বিক্রি করে দিল। মদ আর জুয়া খেলে সে সব টাকা পয়সা ফুরিয়ে ফেলল। সে আবার গরীব হয়ে গেল। ভাবল শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে আবার কিছু টাকা পয়সা নিয়ে আসবে। কারণ নয়নানন্দ জানে রত্নাবতী কুয়োর মধ্যে ডুবে মরে গেছে। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে এসব কথা কেউ জানে না। মনে মনে এ কথা ভেবে সে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

রত্নাবতী স্বামীকে দেখে খুশি হল। ভাবল যাক্, এতদিন পর নিশ্চয় ওর স্বামী নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। হঠাৎ যদি আমাকে দেখে তাহলে এখনই ভয়ে পালিয়ে যাবে। তাই রত্নাবতী স্বামীর কাছে গিয়ে বলল তুমি কিছু ভেব না। এই বাড়িতে ওসব কথা কেউ জানে না। তুমি লজ্জা পেও না। আমি সবাইকে বলেছি দস্যুরা আমার সব গয়নাগাটি নিয়ে গেছে। তারা তোমাকেও ধরে নিয়ে গেছে। আমার বাবা-মা তোমার জন্যে খুবই চিন্তিত। তোমাকে দেখলে তাঁরা খুবই খুশি হবেন। তুমি আর আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো না।

রাতে রত্নাবতী বাবার দেওয়া নতুন গয়নাগাটি পরে শোবার ঘরে ঢুকল। পুরোনো দুঃখ কষ্ট ভুলে স্বামীর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করল। কিন্তু নয়নানন্দের মনে অন্য চিন্তা। সে ঘুমের ভান করে শুয়ে পড়ল। রত্নাবতী যেই ঘুমিয়ে পড়ল, তখনই নয়নানন্দ ধারালো খাঁড়া দিয়ে বউকে খুন করে তার গায়ের সমস্ত গয়না নিয়ে পালিয়ে গেল।

banglainternet.com

গল্প শেষ করে শারি বলল মহারাজ, শুনলেন তো সব কথা। এতো আমি নিজের চোখে দেখেছি। সেই থেকে পুরুষের উপর আমার ঘৃণা ধরে গেছে। বুঝেছি পুরুষেরা খুব স্বার্থপর ও দয়ামায়াহীন হয়। ওরা বিষধর সাপের চাইতেও ভয়ঙ্কর, ওদের সঙ্গে থাকা যায় না।

রাজা হেসে বললেন ঠিক আছে শারি, তোমার কথা তো শুনলাম পুরুষদের কেন পছন্দ করো না, এবার শুক বল, কেন তুমি মেয়েদের দেখতে পার না?

শুক এবার বলতে শুরু করল—কাঞ্চনপুর নগরে সাগর দত্ত নামে এক বণিক ছিল। তাঁর ছেলের নাম ছিল শ্রীদত্ত। রূপে, গুণে ও স্বভাবে সে খুবই ভাল ছিল। শ্রীদত্তের বিয়ে হল অনঙ্গপুরের সোমদত্ত বণিকের মেয়ে জয়শ্রীর সঙ্গে। বিয়ের পর শ্রীদত্ত বাণিজ্য করতে গেলে ওর বউ বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকল। স্বামী নেই তাই জয়শ্রীর মন ভাল নেই। অন্য সখীরা স্বামী নিয়ে কি সুন্দর ঘর-সংসার করছে, আর জয়শ্রীর স্বামী থেকেও নেই, নিজের ঘর-সংসার নেই। একদিন ওর প্রিয় সখীকে মনের দুঃখের কথা বলল। সব শুনে সখী বলল একটু অপেক্ষা কর, দেখবে তোমার স্বামী ফিরে আসবে। ভগবান তোমার প্রতি মুখ তুলে চাইবেন। একদিন জয়শ্রী জানলা দিয়ে এক সুন্দরপুরুষকে দেখতে পেল। মনে মনে ভাবল এই পুরুষের সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হতো তাহলে খুবই সুখী হতাম। জয়শ্রী ওর সখীকে ডেকে বলল সখী, যেমন করে পার ওই পুরুষের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও। সখী সেই পুরুষটির কাছে গিয়ে বলল—সোমদত্তের মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সন্ধ্যার পর আপনি আমার ঘরে আসুন। এই প্রস্তাবে পুরুষটিও রাজী হয়ে গেল। ছেলেটি খুব পরিপাটি হয়ে এল। জয়শ্রীও সেখানে গেল। দুই জনের আলাপ-পরিচয় হল। আস্তে আস্তে ওদের বন্ধুত্ব বাড়তে লাগল।

কিছুদিন পর শ্রীদত্ত বাণিজ্য সেরে শ্বশুর বাড়িতে ফিরে এল। স্বামীকে ফিরে আসতে দেখে জয়শ্রী মনে মনে মোটেই খুশি হল না। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ি দুইজনেই খুব খুশি হলেন। রাতে স্বামী-স্ত্রীর দেখা হল। জয়শ্রীর মুখে কোন হাসি নেই। রাগে মুখটা ভারী হয়ে উঠল। শ্রীদত্ত ওকে সুন্দর সুন্দর উপহার দিল। জয়শ্রী সেগুলো নিল না বরং ছুঁড়ে ফেলে দিল। শ্রীদত্ত মনের কষ্টে ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে জয়শ্রী স্বামীর দেওয়া ওই সব দামী শাড়ি গয়না পরে গভীর রাতে একা বেরিয়ে পড়ল। এদিকে একটা চোর কাছেই লুকিয়েছিল। এত রাতে এই রকম সাজপোষাকে একজন বউকে দেখে চোর ওর পিছু পিছু চলতে লাগল।

সেই পুরুষটি একটা গাছের তলায় জয়শ্রীর জন্যে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ একটা বিষধর সাপ তাকে কামড়ে দেয় এবং সে মারা যায়। জয়শ্রী বুঝতে পারে না লোকটি মারা গেছে। সে বারবার ওকে ধাক্কা দিতে থাকে। ভাবে ওর আসতে দেরী হওয়ায় লোকটা রাগ করেছে। এদিকে চোরটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখতে থাকে আর মনে মনে হাসতে থাকে।

সামনেই একটা শিরীষ গাছ ছিল, তাতে একটা পিশাচ থাকতো। পিশাচটা জয়শ্রীর এইসব কাণ্ড দেখে খুব ক্ষেপে গেল। মনে মনে বলল বউটা খুব খারাপ, ওকে শাস্তি দেওয়া উচিত। এই ভেবে পিশাচটা ওই মরা লোকটার মধ্যে গিয়ে জয়শ্রীর নাকের ডগাটা দাঁত দিয়ে কেটে নিয়ে ফের গাছে গিয়ে বসে রইল।

চোরটা তো এই মজার কাণ্ড দেখে খুবই অবাক হয়ে গেল। এতক্ষণে জয়শ্রী বুঝতে পারল লোকটা মারা গেছে। এখন কি উপায়। জয়শ্রী ছুটে গিয়ে সখীকে সব কথা জানিয়ে বলল, সখী আমাকে বিষ এনে দাও। আমি কি করে মুখ দেখাবো। ঘরে যে আমার স্বামী রয়েছে। অনেক ভেবে চিন্তে ওর সখী একটা বুদ্ধি দিল, বলল সখী তুমি ঘরে গিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে থাক। তোমার কান্না শুনলে তোমার বাবা-মা সবাই ছুটে আসবে। বলবে কি হয়েছে? তখন তুমি বলবে আমার স্বামী আমাকে মেরেছে আর দাঁত দিয়ে আমার নাকের ডগা কেটে দিয়েছে।

এই বুদ্ধি পেয়ে জয়শ্রী দৌড়ে ঘরে ঢুকে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। জয়শ্রীর কান্না শুনে বাড়ির সবাই ছুটে এল। দেখল মেয়ের নাক কাটা। সমস্ত গা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। জয়শ্রী শ্রীদত্তকে দেখিয়ে বলল, ওই আমার এমন সর্বনাশ করেছে। সবাই মিলে শ্রীদত্তকে যা নয় তা-ই বলতে লাগল। বেচারা শ্রীদত্ত কিছুই জানে না। অবাক হয়ে সব দেখতে লাগল। আর মনে মনে ভাবল এতদিন দেশে ছিলাম না তাই কোন কিছুই জানি না। বুঝতে পারল ওর বউটা ভাল নয়। শ্রীদত্তের খুবই দুঃখ হল।

পরের দিন শ্বশুর সোমদত্ত জামাইকে কোটালের হাতে সঁপে দিল। তারপর শ্রীদত্তের বিচার হল। বিচারে শ্রীদত্তকে শূলে চড়ানোর আদেশ হলো। এই ঘটনার একমাত্র সাক্ষী ছিল ওই চোরটা। সে কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে সবই দেখছিল। বিনা অপরাধে একটা লোক শাস্তি পাচ্ছে। চোরটার বিবেক বলল এটা অন্যায়। তাই সে বিচারকের সামনে গিয়ে বলল হুজুর আপনি সব না জেনে একজন নিরপরাধীকে শাস্তি দিচ্ছেন। এই মিথ্যেবাদী স্ত্রীলোকটাকে বিশ্বাস করবেন না। ও সব কথা মিথ্যে বলছে। এই বলে চোরটা সমস্ত ঘটনা বিচারককে খুলে বলল।

চোরের কথাকে যাচাই করার জন্যে জয়শ্রীর সখীর বাড়িতে লোক পাঠিয়ে সব ঘটনা জানা হল। তাছাড়া মরা মানুষটাকে সবাই দেখতে পেল। বিচারক চোরের কথাই সত্য বলে মেনে নিলেন ও জয়শ্রীকে শাস্তি দিলেন। ওর মাথা মুড়ে ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরময় ঘোরানোর আদেশ দিলেন। আর শ্রীদত্তকে অন্যায় বিচার করা হয়েছে বলে তাকে পুরস্কার দিলেন।

গল্প শেষ করে শুক বলল এবার বলুন তো মহারাজ কেন আমি স্ত্রীলোককে পছন্দ করি না। ওদের বিশ্বাস করা যায় না। তাই আমি স্ত্রীলোকের সঙ্গে থাকতে ভালবাসি না।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল এবার বলতো মহারাজ কে বেশী দোষী? নয়নানন্দ না জয়শ্রী? বিক্রমাদিত্য বললেন আমার মতে ওরা দু'জনেই সমান দোষী। ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল কাঁধ থেকে নেমে শ্মশানে ফিরে গিয়ে গাছে ঝুলে পড়ল। বিক্রমাদিত্য ফের তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। এবার বেতাল তার পঞ্চম গল্পটি বলতে শুরু করল।

banglainternet.com

পঞ্চম গল্প

রূপবতী কন্যা

সেকালে ধারা নগরে মহাবল নামে এক রাজা বাস করতেন। রাজার একজন দূত ছিল। তার নাম হরিদাস। হরিদাসের এক পরমা সুন্দরী মেয়ে ছিল। মেয়ের নাম মহাদেবী। মহাদেবীর বিয়ের বয়স হল। বাড়িতে বাবা মা তার বিয়ে দেবার কথা ভাবতে লাগল। একদিন মহাদেবী বাবা হরিদাসকে বলল, বাবা আমি এমন একজন পুরুষকে বিয়ে করবো যিনি সর্বগুণের অধিকারী। হরিদাস মেয়ের কথা শুনে মনে মনে খুবই খুশি হল।

একদিন রাজা মহাবল হরিদাসকে ডেকে বললেন, হরিদাস দক্ষিণ দেশে হরিশচন্দ্র নামে আমার এক বন্ধু আছেন। তার শরীর ভাল যাচ্ছে না। তুমি গিয়ে তার খোঁজ-খবর নিয়ে এস। রাজার আদেশমত হরিদাস রাজা হরিশচন্দ্রের কাছে গিয়ে হাজির হল। হরিশচন্দ্র বন্ধুর সব কথা শুনলেন ও হরিদাসকে উপহার দিলেন। তিনি হরিদাসকে কয়েকটা দিন তাঁর রাজ্যে থেকে যেতে বললেন।

একদিন রাজসভায় রাজা হরিশচন্দ্র হরিদাসকে বললেন, হরিদাস বলতো কলিযুগ কি আরম্ভ হয়ে গেছে?

হরিদাস হাতজোড় করে বলল, হ্যাঁ মহারাজ কলিকাল তো আরম্ভ হয়েছে। যার জন্যে মিথ্যে, অন্যায়, কপটতায়, ছলনায়, স্বার্থপরতায়, সমাজ-সংসার ভরে গেছে। ছেলে বাবাকে শ্রদ্ধা করে না, ভাই ভাইকে স্নেহ করে না। রাজারা প্রজাদের সুখদুঃখের প্রতি নজর দেয় না। শুধু নিজের ধনভাণ্ডার ভর্তি করার দিকে নজর রাখে। ধনদৌলতের অহংকারে মানুষ অন্য মানুষদের ছোট চোখে দেখে। মিষ্টি কথার আড়ালে বুকে ছোরা মারে। তাই তো বলছি মহারাজ এই পৃথিবী থেকে ধর্ম চলে গেছে, অধর্ম এসে সবকিছু দখল করেছে।

রাজা হরিদাসের মুখে এসব জ্ঞানের কথা শুনে খুবই খুশি হলেন ও তার খুব প্রশংসা করলেন। সভা শেষ করে রাজা অন্তঃপুরে চলে গেলেন। হরিদাস তার ঘরে ঢুকে দেখে এক ব্রাহ্মণপুত্র বসে আছে। হরিদাস ওর পরিচয় জানতে চাইলো। ব্রাহ্মণপুত্র বলল আমি আপনার কাছে একটা জিনিস চাইব।

হরিদাস অবাক হয়ে বলল, বল তোমার কি চাই? আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হলে নিশ্চয় তোমাকে দেব।

ব্রাহ্মণপুত্র বলল আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। আপনি আমার সঙ্গে তার বিয়ে দিন।

হরিদাস বলল আমার মেয়ের ইচ্ছে, যে পুরুষ সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ও অসাধারণ গুণসম্পন্ন হবে তাকেই সে বিয়ে করবে। ছেলেটি বলল আমি এক অসাধারণ গুণের অধিকারী, আমি একটা রথ তৈরি করেছি, যাতে চড়ে এক বছরের পথ অল্প সময়ের মধ্যে চলে যাওয়া যায়।

ছেলেটির কথায় হরিদাস বলল, কাল সকালে রথটা নিয়ে এস। রাজার অনুমতি নিয়ে হরিদাস দেশে যাবার জন্যে তৈরি হল। পরদিন ব্রাহ্মণপুত্রের রথে চড়ে অল্প সময়েই ধারা নগরে গিয়ে হাজির হল।

এদিকে হরিদাসের বউ আর ছেলে দুইজন পাত্র ঠিক করে তাদের কথা দিয়েছে হরিদাস ফিরলেই মহাদেবীর সঙ্গে বিয়ে দেবে। হরিদাস বাড়ি ফিরতে দুই পাত্র এসে হাজির। হরিদাস তো মহা বিপদে পড়ল। তিন পাত্রদের মধ্যে কাকে ঠিক করবে, কারণ ওরা তিনজনই বিদ্যায় বুদ্ধিতে ও গুণে সমান। তাই হরিদাস তিনপাত্রকে বলল আজকের রাতটা তোমরা আমার বাড়িতে থাক, কাল সকালে সব ঠিক করবো। এদিকে রাত্রিবেলা বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস এসে মহাদেবীকে চুরি করে নিয়ে গেল। সকালে সবাই দেখে মহাদেবী ঘরে নেই। তিন ব্রাহ্মণ পাত্রও সব শুনলো। ওদের মধ্যে একজন সমাধি বলে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব চোখের সামনে দেখতে পারতো। সে বলল আমি দেখতে পাচ্ছি এক রাক্ষস আপনার মেয়ের রূপগুণ দেখে তাকে তুলে নিয়ে গেছে বিন্ধ্যপাহাড়ে। এবার ওখান থেকে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ পাত্র বলল আমি এমন বিদ্যা জানি যার সাহায্যে শব্দকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে ঐ রাক্ষসকে হত্যা করতে পারি, কিন্তু সেখানে কিভাবে যাবো, সেটা ভাবতে হবে।

ব্রাহ্মণপাত্র বলল কোন চিন্তা নেই, আমার রথ আছে। এই রথে চড়ে অল্প সময়েই সেখানে পৌঁছে যেতে পারবো। সঙ্গে সঙ্গে রথে চড়ে সেখানে গিয়ে মহাদেবীকে রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে এল। এবার বিবাদ লাগল তিন ব্রাহ্মণ পাত্রের মধ্যে কে বিয়ে করবে মহাদেবীকে। সবাই তাকে বিয়ে করতে চায়। তিন ব্রাহ্মণ পাত্রের অসাধারণ গুণের জন্যে মহাদেবীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। হরিদাস তাই তিন পাত্রকে নিয়ে খুবই চিন্তায় পড়ল।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, বলতো মহারাজ, এই তিন পাত্রের মধ্যে মহাদেবীকে কার বিয়ে করা উচিত।

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, যোগ্য পাত্র হচ্ছে যে যুদ্ধ করে মহাদেবীকে ফিরিয়ে এনেছে। তার সাথেই মহাদেবীর বিয়ে হওয়া উচিত। এই উত্তরে বেতাল বলল তিন জনই অসাধারণ গুণের অধিকারী। এদের মধ্যে একজনের সাহায্য না পেলে মহাদেবীকে উদ্ধার করা সম্ভব হতো না। তবে দ্বিতীয় জনই কেন মহাদেবীকে বিয়ে করতে পারবে?

রাজা বললেন মানছি তিন পাত্রই অসাধারণ গুণের অধিকারী। তবুও দ্বিতীয়জনের সাহায্য ছাড়া মহাদেবীকে উদ্ধার করা যেত না। তাই যোগ্য পাত্র দ্বিতীয় জন, তার সাথেই বিয়ে হওয়া উচিত।

বেতাল সঠিক উত্তর শুনে ফের বিক্রমাদিত্যের কাঁধ থেকে নেমে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল।

রাজা পিছন পিছন ছুটে গিয়ে গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে ফের চলতে লাগলেন। বেতাল এবার তার ষষ্ঠ গল্প শুরু করল।

banglainternet.com

ষষ্ঠ গল্প

সুকর্মের সুফল

সেকালে ধর্মপুর নামে এক বিখ্যাত নগরে ধর্মশীল নামে এক রাজা ছিলেন। রাজার মনে খুব দুঃখ। কারণ, তার কোনও সন্তান ছিল না। তাঁর মন্ত্রীর নাম অন্ধক। মন্ত্রী অন্ধক একদিন রাজাকে বললেন, মহারাজ আপনি একটা মন্দির তৈরি করে তাতে দেবী কাত্যায়নীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করুন ও প্রতিদিন পূজা করুন। এতে আপনার ভালো হবে।

মন্ত্রীর কথামতো রাজা একটা সুন্দর মন্দির তৈরি করে তাতে কাত্যায়নী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রতিদিন খুব নিষ্ঠাসহ পূজা করতে লাগলেন। কিন্তু রাজার মনে সুখ নেই। এত পূজা অর্চনা করেও রাজার পুত্র সন্তান হলো না। রাজা ভাবেন কি করলে পুত্র লাভ হবে। মনে শান্তি নেই। একদিন মন্ত্রীর পরামর্শ মতো রাজা মন্দিরে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে দেবীকে বললেন, দেবী তুমি তো ত্রিলোকজননী। তুমি কি ভক্তের মনের কষ্ট বোঝ না। আমার মনের একটা ইচ্ছা পূরণ কর মা। এই বলে রাজা দেবীর কাছে বারবার পুত্র সন্তান চাইতে লাগলেন।

ভক্তের ভক্তি দেখে দেবী দৈববাণী করলেন, বললেন তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ হবে।

শুনে রাজা বললেন মা আমাকে একটা পুত্র সন্তান দাও। দেবী বললেন, শীঘ্রই তোমার পুত্র হবে। তোমার পুত্র খুব শান্ত স্বভাবের হবে। ও সব বিষয়ে পারদর্শী হবে। রাজা বর পেয়ে খুব খুশি হলেন। কিছুদিন পর রাজা পুত্র লাভ করলেন। রাজা ও রানী রাজপুত্রকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে দেবী কাত্যায়নীর পূজা দিলেন।

সেই সময় দীনদাস নামে এক তাঁতীর ছেলে বন্ধুর সঙ্গে রাজধানীতে এসেছিল। দীনদাস এক তাঁতীর মেয়েকে দেখে খুবই খুশি হয়। এমন রূপ যা দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। দীনদাসের মনের মধ্যে তখন একটাই কথা, ওই মেয়েটিকে যদি বিয়ে করতে পারি, তাহলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। দীনদাস ভাবল রাজা যদি দেবী কাত্যায়নীর আশীর্বাদে ছেলে পেতে পারেন, তাহলে আমিও দেবীর কাছে বর চাইতে পারি। দেবীর কৃপায় দেখি ওকে বিয়ে করতে পারি কিনা। এই ভেবে দীনদাস মন্দিরে ঢুকে দেবীর কাছে ভক্তিভরে প্রণাম করে বলল, মা যদি তোমার দয়ায় ওই রূপসী মেয়েকে বিয়ে করতে পারি তাহলে নিজের হাতে আমার মাথা কেটে তোমার পূজা দেব। এই প্রতিজ্ঞা করে দীনদাস বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি ফিরে গেল। কিন্তু মনের মধ্যে শান্তি

নেই। দিনরাত মেয়েটির কথা ভাবতে লাগল। বন্ধু দীনদাসের এই অবস্থা দেখে ওর বাবাকে সব কথা জানালো। তারপর দীনদাসের বাবা ঠিক করলেন ওই মেয়ের সঙ্গেই ছেলের বিয়ে দেবেন। কয়েকদিনের মধ্যে কথাবার্তা বলে ওদের বিয়েটাও হয়ে গেল। দীনদাস বিয়েতে প্রচুর যৌতুক পেল। সুন্দরী বউকে পেয়ে দীনদাস প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেল।

বেশ কিছুদিন পর দীনদাস বউ ও বন্ধুকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি এল। দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরের সামনে এসেই মনে পড়ে গেল আগের প্রতিজ্ঞার কথা। ও ভাবল আমি এতদিন ভুলেই গিয়েছিলাম আমার প্রতিজ্ঞার কথা। আমি অন্যায় করেছি, আমি পাপী। মার সামনে শপথ করে তাকে ভুলে গিয়েছিলাম। আর দেরী করা ঠিক হবে না। এখনই আমার প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে। এই কথা ভেবে দীনদাস বন্ধু আর বউকে বাইরে দাঁড় করিয়ে মন্দিরের ভিতর ঢোকে।

কাত্যায়নী দেবীকে প্রণাম করে দীনদাস বলে, মা আমি তোমাকে কথা দিয়ে ভুলে গিয়েছিলাম। তাই আমার পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি নিজেকে তোমায় উৎসর্গ করছি। এই বলে দীনদাস মন্দিরের খড়্গটা নিয়ে নিজের মাথাটা কেটে ফেললো।

দীনদাস ফিরে আসছে না দেখে বন্ধু দীনদাসের বউকে বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি দেখে আসি, ও কি করছে। মন্দিরের ভিতরে ঢুকেতো বন্ধু হতবাক হয়ে গেল, দু'খণ্ড হয়ে পড়ে আছে দীনদাসের দেহটা। এই দেখে বন্ধু ভাবল সবাই ভাববে ওই দীনদাসকে এইভাবে খুন করেছে। কেউ বিশ্বাস করবে না দীনদাস নিজে এই কাজ করেছে। সবাই ওকে বলবে দীনদাসের সুন্দরী বউকে পাবার জন্যে এই কাজ আমিই করেছি। এই ভেবে বন্ধুটি খড়্গ দিয়ে নিজের মাথাটা কেটে ফেলল।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। কেউই ফিরছে না দেখে দীনদাসের বউটি ওই মন্দিরে গিয়ে ঢুকল। মন্দিরে দুইটা কাটা মুণ্ডু দেখেতো বউটা বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল এসব আমারই পাপের ফল। আমার এইভাবে বেঁচে কি লাভ? তার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। এই ভেবে বউটি রক্তমাখা খড়্গটা হাতে তুলে নিয়ে যেই মাথাটা কাটতে যাবে ঠিক তক্ষুণি দেবী কাত্যায়নী ওর হাতটা ধরে বলল, বাছা তোমার সাহস ও দৃঢ়তা দেখে আমি খুবই খুশি হয়েছি। বল কি বর চাও তুমি?

দীনদাসের বউটি বলল, যদি সত্যিই আমার প্রতি তোমার দয়া হয়ে থাকে, তাহলে তুমি এখনই ওদের মাথা জোড়া লাগিয়ে দাও। ওদের বাঁচিয়ে দাও।

দেবী হেসে বললেন তাই হবে। তুমি নিজের হাতে ওদের মাথাদুটো জোড়া লাগিয়ে দাও। এই বলে দেবী ওখান থেকে চলে গেলেন। দীনদাসের বউ এই বর পেয়ে তাড়াতাড়ি নিজের হাতে মাথা দুটো, দুই দেহে জুড়ে দিল। ওরা প্রাণ ফিরে পেল। মজাটা হলো বউটি তাড়াতাড়িতে একজনের মাথা অন্যজনের দেহে লাগিয়ে দিয়েছে।

এই গল্প শেষ করে বেতাল বলল মহারাজ বলতো এই দুইজনের মধ্যে কে বউটির স্বামী হবে?

রাজা বিক্রমাদিত্য হেসে বললেন, তুমিতো জান নদীর মধ্যে গঙ্গা বড়, পর্বতের মধ্যে সুমেরু, গাছের মধ্যে কল্পতরু, তেমনি প্রাণীদের দেহের মধ্যে মাথাই হচ্ছে প্রধান।

banglainternet.com

শাস্ত্রকাররা যার জন্যে মাথার নাম রেখেছেন ভক্তমাঙ্গ। তাই দীনদাসের মাথাটা যে শরীরে জোড়া লাগানো হয়েছে সেই হবে বউটির স্বামী।

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে রাজার কাঁধ থেকে নেমে সোজা শ্মশানে গিয়ে সেই গাছে উঠে পড়ল। বিক্রমাদিত্য ফের তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে করে চাপিয়ে চলতে লাগলেন। এরপর বেতাল তার সপ্তম গল্প বলতে শুরু করল।

সপ্তম গল্প

শব্দভেদী বাণ

বহুকাল পূর্বে চম্পা নগরে চন্দ্রাপীড় নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রানীর নাম ছিল সুলোচনা আর রাজকন্যার নাম ছিল ত্রিভুবনসুন্দরী। রাজকন্যা বড় হলে মেয়েকে বিয়ে দেবার জন্যে রাজা পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। তাছাড়া ত্রিভুবনসুন্দরীর রূপ-গুণের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নানা দেশের রাজারা তাঁদের ছবি পাঠাতে লাগলেন। রাজা সেই ছবিগুলো রাজকন্যার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু রাজকন্যার একজনকেও পছন্দ হল না।

রাজা চন্দ্রাপীড় কোন উপায় না দেখে স্বয়ংবর সভার কথা বললেন। কিন্তু রাজকন্যা রাজী হল না। সে বলল স্বয়ংবরের দরকার নেই। যে পুরুষ বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তিতে শ্রেষ্ঠ আমি তাকেই বিয়ে করবো।

বেশ কিছুদিন পর দূর দেশ থেকে চারজন যুবক রাজপুরীতে এল। রাজা ওদের নিজেদের গুণের পরিচয় দিতে বললেন।

প্রথম যুবকটি বলল মহারাজ আমার বিশেষ গুণ হচ্ছে আমি প্রতিদিন একটা কারুকার্য করা কাপড় বুনি। সে কাপড়টা বিক্রি করে পাঁচটা রত্ন পাই। একটা রত্ন ব্রাহ্মণকে দিই। একটা দেবতাকে দিই আর একটা নিজের গায়ে পরি, আর একটা যত্ন করে রেখে দিই। যে আমার স্ত্রী হবে তার জন্যে। আর শেষেরটা খরচ করে দিন চালাই। এই গুণ আর কারও আছে কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয় যুবকটি বলল, মহারাজ আমি সমস্ত পশু-পাখির ভাষা জানি। আমার মতো গুণবান পুরুষ আর কে হতে পারে?

তৃতীয় যুবকটি বলল, মহারাজ আমি হচ্ছি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। আমার মতো পণ্ডিত আর কেউ নেই। আমি সমস্ত শাস্ত্র জানি।

চতুর্থ যুবকটি বলল, মহারাজ আমার একটা বিশেষ গুণ হচ্ছে আমি শব্দভেদী বাণ মারতে পারি। এমন গুণের পুরুষ আর কে হতে পারে?

চারজন যুবকের গুণের কথা শুনে রাজা চন্দ্রাপীড় অবাক হয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, পাত্র হিসেবে চারজনই তাঁর মেয়ে ত্রিভুবনসুন্দরীর জন্যে উপযুক্ত। এদের মধ্যে একজনকে বেছে রাজকন্যাকে বিয়ে দিতে হবে। রাজা মেয়েকে গিয়ে এই চার যুবকের গুণের কথা বললেন। সব শুনে ত্রিভুবনসুন্দরী খুব লজ্জা পেল, কোন কথা বলল না।

banglainternet.com

এই গল্প বলে বেতাল বলল, মহারাজ যুক্তি দিয়ে বলতো কে ত্রিভুবনসুন্দরীর স্বামী হবার যোগ্য?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, যে কাপড় বুনে বিক্রি করে সে জাতে শূদ্র, আর যে পশু-পাখিদের ভাষা জানে সে হচ্ছে বৈশ্য, যে শাস্ত্রজ্ঞ সে ব্রাহ্মণ, যে যুবকটি শব্দভেদী বাণ মারতে শিখেছে সে রাজার ছেলে। শাস্ত্র ও যুক্তি দিয়ে বিচার করলে চতুর্থ যুবকটি রাজকন্যার উপযুক্ত পাত্র।

রাজার সুযুক্তি শুনে বেতাল তাঁর কাঁধ থেকে নেমে গাছে গিয়ে চড়ল। আর রাজাও পিছন পিছন গিয়ে তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে চড়িয়ে পথ চলতে লাগলেন। এবার বেতাল তার অষ্টম গল্প বলতে শুরু করল।

অষ্টম গল্প

চিরঞ্জীবের জয়

বহুকাল পূর্বে মিথিলায় গুণাধিপ নামে এক রাজা ছিলেন। চিরঞ্জীব নামে এক রাজপুত্র যুবক রাজার গুণের কথা শুনে তাঁর কাছে চাকরির আশায় মিথিলায় এসে হাজির হল। সেই সময় রাজা গুণাধিপ রাজ অন্তঃপুরে দিন কাটাচ্ছিলেন। চিরঞ্জীব একটা বছর কাটাল কিন্তু রাজার সঙ্গে দেখা হল না। দেখতে, দেখতে চিরঞ্জীবের টাকা পয়সাও ফুরিয়ে যেতে লাগল। কখন রাজা অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে আসবেন, এই আশায় বসে থাকলে ওকে না খেয়েই মরতে হবে। একথা ভেবে চিরঞ্জীব রাজার আশা ছেড়ে বনে গিয়ে ভগবানের সাধনা করতে লাগল।

বেশ কিছুদিন পর রাজা গুণাধিপ রাজঅন্তঃপুর ছেড়ে রাজকার্যে মন দিলেন। একদিন রাজা সৈন্য সামন্ত নিয়ে শিকারে বের হলেন। একটা হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে তিনি গভীর বনে ঢুকে পড়লেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হরিণ পালিয়ে গেল। এখন রাজা কি করবেন ভাবতে লাগলেন। তিনি মনে মনে ভয়ও পেতে লাগলেন। এমনিতেই গাঢ় অন্ধকার, আবার গভীর বন, তার উপর ভীষণ খিদে, তৃষ্ণাও পেয়েছে। কোথায়ও কিছু নেই। খানিকটা এগিয়ে বনের মধ্যে একটা কুটীর দেখতে পেলেন। কুটীরটা দেখে মনে মনে খুব খুশি হলেন, ভাবলেন যাক্ এখানে অন্তত মানুষের দেখা পাওয়া যাবে। রাজা কুটীরের সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন একজন তপস্বী ধ্যান করছেন। রাজা হাত জোড় করে তার কাছে জল চাইলেন। এই তপস্বী হচ্ছে সেই রাজপুত্র বীর চিরঞ্জীব। চিরঞ্জীব রাজাকে বসিয়ে জল ও ফলমূল খেতে দিল।

জল ও খাবার খেয়ে রাজার শরীরটা সুস্থ হল। বললেন আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন, আমি আপনার কাছে ঋণী। তবে একটা কথা আপনাকে কিন্তু আমার তপস্বী বলে মনে হচ্ছে না। সত্যি করে বলুনতো আপনার আসল পরিচয় কি? কেন আপনি এই গভীর বনে একা একা দিন কাটাচ্ছেন? আমাকে সব খুলে বলুন।

চিরঞ্জীব রাজাকে সব কথা খুলে বলল। চিরঞ্জীবের কথা শুনে রাজা খুবই লজ্জা পেলেন। নিজের পরিচয় না দিয়ে চিরঞ্জীবের কুটীরে রাতটা কাটালেন। পরের দিন সকালে নিজের পরিচয় দিয়ে চিরঞ্জীবকে সঙ্গে করে প্রাসাদে ফিরলেন। তিনি চিরঞ্জীবকে নিজের কাছেই রাখলেন। চিরঞ্জীবও রাজার খুব বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। একবার রাজা চিরঞ্জীবকে কাজের জন্যে বিদেশে পাঠালেন। চিরঞ্জীব কাজ শেষ করে

banglainternet.com

ফেরার পথে সমুদ্রের ধারে একটা সুন্দর মন্দির দেখতে পেল। চিরঞ্জীব মন্দিরে ঢুকে দেবীকে প্রণাম করে মুখ ঘোরাতেই এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পেল। মেয়েটি চিরঞ্জীবকে বলল তুমি এখানে কেন এসেছ? চিরঞ্জীব সব কথাই বলল মেয়েটাকে। মেয়েটি সব শুনে বলল তুমি এই সমুদ্রে ডুব দিয়ে ওঠার পর আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করবো।

চিরঞ্জীব মেয়েটির কথামতো সমুদ্রে ডুব দিয়ে উঠে দেখে ও রাজবাড়ির সামনে এসে হাজির হয়েছে। কোথায় সেই মন্দির, সেই পরমা সুন্দরী মেয়ে আর সমুদ্র?

চিরঞ্জীব ভিজা কাপড় জামা ছেড়ে রাজার কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলল। রাজা এই ঘটনা শুনে বললেন আমি এই অদ্ভুত ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখতে চাই। চল এখনই আমাকে ওখানে নিয়ে চল। ওরা দুইজন সেই মন্দিরে ঢুকে দেবী প্রণাম করে ফিরতেই সেই পরমাসুন্দরী মেয়েটাকে দেখতে পেল। রাজাতো অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন। ওই সুন্দরী মেয়েটিও রাজার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। রাজার সামনে এসে বলল—মহারাজ, আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন আমি তাই করবো। রাজা বললেন—যদি তুমি আমার কথা শোন তাহলে আমার প্রিয়পাত্র চিরঞ্জীবকে বিয়ে কর।

এই কথা শুনে মেয়েটি বলল, মহারাজ আমি আপনার রূপ গুণে মুগ্ধ হয়েছি, আমি অন্যকে কি করে বিয়ে করবো?

রাজা বললেন তুমি কথা দিয়েছ আমি যা বলব তাই করবে। তাই আমার আদেশ তুমি অমান্য করবে না।

রাজার এই কথা শুনে মেয়েটি চিরঞ্জীবকে বিয়ে করতে রাজী হল। রাজা গুণাধিপ ওদের দুইজনকে গন্ধর্ব মতে বিয়ে দিয়ে রাজধানীতে নিয়ে এলেন এবং ওদের সব রকম সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিলেন।

এই বলে বেতাল বলল, বলতো রাজা আর চিরঞ্জীবের মধ্যে কে বেশি মহৎ আর উদার। রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন চিরঞ্জীবই বেশি মহৎ, কারণ চিরঞ্জীব জঙ্গলে অসহায় রাজাকে জল ও ফলমূল খাইয়ে ও আশ্রয় দিয়ে যে উপকার করেছে তার তুলনা হয় না। পরে অবশ্য রাজাও চিরঞ্জীবের উপকার করেছেন। তবে এখানে চিরঞ্জীবই বেশি মহৎ ও উদার।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল রাজার কাঁধ থেকে নেমে গাছে উঠে গেল। বিক্রমাদিত্য তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে আবার পথ চলতে লাগলেন। বেতাল এবার তার নবম গল্প বলতে শুরু করল।

নবম গল্প

চোরের উদারতা

পুরাকালে মগধপুর নামে এক রাজ্যের রাজা ছিলেন বীরবর। বীরবরের প্রজাদের মধ্যে হিরণ্য দত্ত নামে এক ধনী বণিক ছিল। ওই বণিকের মদনসেনা নামে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে ছিল। বসন্ত উৎসবের দিনে মদনসেনা খুব সাজগোজ করে সখীদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেই সময় ধর্ম দত্ত বণিকের ছেলে সোম দত্তও বসন্ত উৎসবে এসেছিল। সে হঠাৎ দূর থেকে মদনসেনাকে দেখতে পায়। মদনসেনাকে দেখে সোম দত্ত মুগ্ধ হয়ে যায় এবং কাছে গিয়ে বলে আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। যদি তুমি আমাকে বিয়ে না কর তাহলে তোমার সামনেই আমি আত্মহত্যা করবো।

মদনসেনা এই কথা শুনে খুবই অস্থির হয়ে উঠল। সোম দত্তকে অনেক করে বোঝাতে লাগল। কিছুতেই ওকে শান্ত করতে পারল না। মদনসেনা ছিল খুব নরম মনের। সে সোম দত্তের প্রাণ রক্ষা করার জন্যে বলল, ঠিক আছে পাঁচ দিন পর আমার বিয়ে হবে। তবে কথা দিলাম শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা না করে আমি স্বামীর সঙ্গে মিলিত হব না।

এই কথা শুনে সোম দত্ত মনে মনে খুশি হয়ে বাড়িতে ফিরে গেল।

পাঁচদিন পর মদনসেনার বিয়ে হয়ে গেল। আত্মীয়স্বজন সব চলে গেল। মদনসেনা শোবার ঘরে ঢুকে খাটের এক কোণে চুপটি করে বসে রইল। স্বামীর সঙ্গে কোন কথা বলল না। স্বামী কথা বলার চেষ্টা করতে লাগল। মদনসেনা কোন কথা না বলায় সে রেগে গেল। তখন মদনসেনা সোম দত্তের সব কথা খুলে বলল। আর বলল আমাকে একবার সোম দত্তের কাছে যাওয়ার অনুমতি দাও। কারণ আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রথমে স্বামী রাজী হল না। পরে ওকে যেতে অনুমতি দিল। মদনসেনা স্বামীর অনুমতি পেয়ে ওই মাঝরাতে এক-গা গয়না পরে সোম দত্তের বাড়ির দিকে রওনা দিল। পথের মাঝে এক চোর পথ আগলে মদনসেনাকে বলল, তোমার কোন ভয়-ডর নেই, এক-গা গয়না পরে এই রাতে কোথায় যাচ্ছ?

মদনসেনা বলল ভয় কেন পাব? আমি বণিক হিরণ দত্তের মেয়ে। স্বামীর অনুমতি পেয়েই সোম দত্তের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। এভাবেই আমার প্রতিজ্ঞা পালন করা হবে।

banglainternet.com

চোর সব শুনে ওর গা থেকে যেই গয়না খুলতে যাবে, তখনই মদনসেনা বলল, ভাই আমি এসব গয়না তোমাকেই দেব প্রতিজ্ঞা করেছি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, আমি প্রতিজ্ঞা পালন করে এখনই ফিরে আসছি।

মদনসেনার কথায় চোর বিশ্বাস করে অপেক্ষা করতে লাগল। মদনসেনা সোম দত্তের ঘরে ঢুকে দেখে সোম দত্ত ঘুমাচ্ছে। ওকে জাগাতেই সোম দত্ত অবাক হয়ে বলল, এতরাতে তুমি এখানে কিভাবে এলে?

মদনসেনা হেসে বলল আমি যে তোমাকে কথা দিয়েছিলাম। তাই কথা রাখতে এসেছি। আমার স্বামীর অনুমতি নিয়েই এসেছি।

সোম দত্ত খানিকক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর বলল তুমি যে প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যে এতখানি কষ্ট স্বীকার করেছ সেজন্যে আমি খুশি হয়েছি। তোমার স্বামী সব জেনেও তোমাকে আমার কাছে আসতে দিয়েছে, এতে তার উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। এখন তুমিতো পরস্ত্রী। তুমি তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাও। তোমরা সুখী হও।

এদিকে চোরটাতো বসে বসে ভাবছে মেয়েটা নিশ্চয় আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে। আমার মত মূর্খ কি এই জগতে আর আছে? এমন সময় মদনসেনা এসে হাজির হল। চোরটাও মদনসেনাকে ফিরে আসতে দেখে খুবই অবাক হয়ে গেল। ভাবল নিজের গায়ের গয়না দেবার জন্যে ফিরে এসেছে, এইরকম কথার দাম! চোরটা খুব খুশি হয়ে বলল তোমার ব্যবহারে আমি খুব খুশি হয়েছি। তোমার গয়নার উপর আমার কোন লোভ নেই। তুমি তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাও।

মদনসেনার স্বামী ওকে যেতে মত দিলেও মনে মনে মোটেই খুশি হয়নি। তাই ফিরে আসার পর মদনসেনার সঙ্গে সে আগের মতো ব্যবহার করল না। কোন কথা বলল না, চুপচাপ শুয়ে থাকলো।

এতখানি বলে বেতাল বলল এবার বলতো মহারাজ, এই চার জনের মধ্যে কে সবচেয়ে মহৎ ও ভাল মানুষ?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন আমার মতে চোরই মহৎ ও ভাল মানুষ। কারণ মদনসেনার স্বামী ওকে বিশ্বাস করেও মনে মনে খুশি হয়নি। যদি ও খুশি মনে মদনসেনার প্রস্তাব মেনে নিত, তাহলে ফিরে আসার পর ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতো না। সোম দত্ত প্রথমে মদনসেনাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল। পরে শাস্তির ভয়ে ওকে ফিরিয়ে দিল। এইভাবে ওকে অত রাতে একা ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি। আর মদনসেনা মোটেই ঠিক কাজ করেনি। প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যে গভীর রাতে একা বেরনো অনুচিত হয়েছে।

কিন্তু চোরের কাজতো চুরি করা। সে সুযোগ পেয়েও মদনসেনার গা থেকে গয়না খুলে নেয়নি। মদনসেনার কথা বিশ্বাস করে অপেক্ষা করেছে। এই রকম ব্যবহার একটা চোরের কাছে আশা করা যায় না। তাই এখানে চোরই সবচেয়ে ভাল মানুষ ও মহৎ।

ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল বিক্রমাদিত্যের কাঁধ থেকে নেমে আবার গাছে চড়ে বসল। বিক্রমাদিত্য সেই গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে কাঁধে চাপিয়ে পথ চলতে লাগলেন। বেতাল এবার তার দশম গল্প বলতে শুরু করল।

দশম গল্প

রাজার তিন রানী

প্রাচীনকালে গৌড় দেশে বর্ধমান নামে এক নগর ছিল। সেখানে গুণশেখর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, তার নাম ছিল অভয়চন্দ্র। রাজা মন্ত্রীর কথা খুব মানতেন। রাজা সবসময় মন্ত্রীর মুখে বৌদ্ধের বাণী শুনে শুনে তিনিও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে রাজা পূজা ও শাস্ত্রানুযায়ী সব রকম কাজ বন্ধ করে দিলেন। ঘোষণা করলেন যারা এইসব করবে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

প্রজারা রাজার ভয়ে সব ত্যাগ করল। যারা লুকিয়ে পূজা করত তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো।

এদিকে মন্ত্রী অভয়চন্দ্র সবসময় রাজাকে বলত, মহারাজ অহিংসা হচ্ছে পরমধর্ম। সব ধর্মের উপরে অহিংসা ধর্ম। প্রতিটি প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করা মহৎ কাজ। পরের মাংস খেয়ে যারা নিজেদের দেহের মাংস বৃদ্ধি করে, তাদের মত পাপী এই জগতে আর নেই। মাংস ও মদ খাওয়া খুবই অন্যায়। মদ ও মাংস না খেলে আয়ু, বিদ্যা, বল, ধন সবই বৃদ্ধি পায়। এইভাবে বৌদ্ধধর্মের কথা শুনে শুনে রাজা বৌদ্ধধর্ম ছাড়া কিছুই ভাবতেন না। যে মানুষ রাজার কাছে বৌদ্ধধর্মের গুণগান করতো তাকে তিনি ভালবেসে পুরস্কার দিতেন। ক্রমে প্রজারাও বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল।

রাজার মৃত্যু হলে তাঁর ছেলে ধর্মধ্বজ রাজা হলেন। ধর্মধ্বজ হলেন ঠিক পিতার উল্টো। উনি সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি রাজা হয়ে বৌদ্ধদের শাস্তি দিতে লাগলেন। রাজমন্ত্রী অভয়চন্দ্রকে কঠিন শাস্তি দিলেন। মন্ত্রীকে মাথা মুড়িয়ে গাধার পিঠে চাপিয়ে নগরের বাইরে বের করে দিলেন। যার ফলে প্রজারা আবার সনাতন ধর্ম ফিরে পেল।

বসন্ত উৎসবে রাজা ধর্মধ্বজ তাঁর তিন রানীকে সঙ্গে নিয়ে উপবনে বেড়াতে গেলেন। সেখানে একটা সরোবর ছিল। সরোবরে অনেক পদ্মফুল ফুটেছিল। রাজা নিজে সরোবরে নেমে পদ্মফুল তুলে রানীদের দিলেন। একটা পদ্মফুল এক রানীর পায়ের উপর গিয়ে পড়ল। এতে রানী এত চোট পেল যে তার পা ভেঙ্গে গেল। রানী যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগলেন।

banglainternet.com

চাঁদের আলো লেগে দ্বিতীয় রানীর গায়ে ফোস্কা পড়ে গেল। সেও ব্যথায় ছটফট করতে লাগল। সেই সময় কোন বাড়িতে হামান দিস্তার শব্দ হওয়ায় তৃতীয় রানী অজ্ঞান হয়ে গেল।

এই গল্প বলে বেতাল বলল মহারাজ বলুনতো কোন রানীর শরীর সবচেয়ে কোমল?

রাজা বললেন যে রানীর শরীরে চাঁদের আলোয় ফোস্কা পড়ে তার মতো নরম শরীর কার হতে পারে বল?

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে গাছে গিয়ে উঠল। আর রাজা বিক্রমাদিত্য তাকে গাছ থেকে নামিয়ে পথ চলতে লাগল।

এবার বেতাল তার একাদশ গল্প বলতে শুরু করল।

একাদশ গল্প

মন্ত্রীর অকাল মৃত্যু

পুণ্যপুর নগরে বল্লভ নামে এক রাজা ছিলেন। প্রজারা তাঁকে খুব ভক্তি করতো। রাজা খুব দান-ধ্যানও করতেন। তার মন্ত্রীর নাম ছিল সত্যপ্রকাশ। একদিন রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, দেখ আমি ভেবে দেখেছি রাজা হয়ে যদি সবার জন্যে এত ব্যস্ত থাকি তাহলে নিজেকে দেখব কখন? রাজা যখন হয়েছি তখন সুখভোগ করে বেঁচে থাকবো। অন্যের জন্যে সময় নষ্ট করবো না। তাই বলছি এখন থেকে তুমি আমার হয়ে রাজ্যের সব কাজকর্ম দেখবে। আমি এখন থেকে নিজেকে সুখ সাগরে ভাসিয়ে দেব।

রাজার কথায় মন্ত্রী খুশি হলেন। তবে খুবই চিন্তায় পড়লেন। তিনি মন্ত্রী হয়ে কি করে রাজকার্য চালাবেন। উপায় কি, বাধ্য হয়ে তিনিই রাজকার্য চালাতে লাগলেন। কিন্তু মনে শান্তি পেলেন না। সবসময় বাড়িতে বসে ভাবেন রাজা আমার উপর সব দায়িত্ব দিয়ে নিজে দিব্যি সুখ সাগরে ভাসছেন। রাজ্যের কোন দিকে নজর দিচ্ছেন না। একা আমি সবকিছু কি করে সামলাব?

মন্ত্রীর এত ভাবনাচিন্তা দেখে মন্ত্রীর বউ লক্ষ্মী বললো, তোমার কি হয়েছে? আগে তো এমন ভাবতে না। তুমি রাজকার্য দেখাশোনা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। রাজকার্য চালানো তো তোমার কাজ নয়। এইসব ছেড়ে কিছুদিন তীর্থে ঘুরে এস। এতে শরীর ও মন দুই ভাল হবে। সত্যপ্রকাশ স্ত্রীর কথামতো রাজার কাছে গিয়ে বলল, মহারাজ আমি একটু তীর্থে যেতে চাই। আপনি অনুমতি দিন। রাজার অনুমতি পেয়ে সত্যপ্রকাশ তীর্থে বেরিয়ে পড়লেন। অনেক তীর্থ ঘুরে শেষে এল দক্ষিণ সেতুবন্ধ রামেশ্বরে। এখানে মহাদেবের মন্দিরে পূজো দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলেন। দেখলেন সমুদ্রের ঢেউ থেকে বিশাল এক সোনার গাছ উঠে এলো। গাছের মাথায় পরমাসুন্দরী এক মেয়ে বীণা বাজিয়ে গান করছে। এই দৃশ্য দেখে সত্যপ্রকাশ অবাক হয়ে গেল। সে বিস্ময়ে দেখতে লাগল এক সময় গাছটা জলের তলায় ডুবে গেল।

দেশে ফিরেই সত্যপ্রকাশ রাজার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে সমস্ত কথা বলল। রাজা সব কথা শুনে সত্যপ্রকাশের হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে রামেশ্বরে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে মন্দিরে ঢুকে মহাদেবের পূজা দিয়ে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নৌকায় চড়ে সেই সোনার গাছে উঠে বসলেন। আর গাছটা রাজাকে নিয়ে পাতালে চলে গেল। পাতালে যাবার পর সেই অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি বলল, তোমার বীরত্ব ও সাহস দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তুমি এখানে কেন এসেছ? তোমার পরিচয় কি?

banglainternet.com

রাজা নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তোমার রূপ ও গুণ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। সুন্দরী মেয়েটি বলল আমারও তোমাকে দেখে ভাল লেগেছে। আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি, তবে একটা শর্ত মেনে চলতে হবে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে তুমি আমার সঙ্গে থাকতে পারবে না।

এই প্রস্তাবে রাজা রাজী হলেন ও তারা গন্ধর্বমতে বিয়ে করলেন। তারপর বেশ সুখে-শান্তিতে দিনগুলো কাটছিল। কৃষ্ণা চতুর্দশীতে রানী রাজাকে তার শর্ত মনে করিয়ে দিয়ে তাঁকে দূরে চলে যেতে বলল।

রাজা কথা রাখলেন ঠিকই কিন্তু মনে মনে ভাবতে লাগলেন রানী তাকে এইভাবে কেন দূরে চলে যেতে বলল? মনের মধ্যে কৌতূহল বাড়তে লাগল। তাই রাজা রাতের অন্ধকারে হাতে একটা তরবারি নিয়ে লুকিয়ে থেকে সব দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ দেখলেন একটা রাক্ষস এসে রানীকে ধরার চেষ্টা করছে। রাজা খুব রেগে গিয়ে হাতের তরবারি দিয়ে রাক্ষসের মাথাটা কেটে ফেললেন।

রানী আনন্দে কেঁদে ফেলল। বলল মহারাজ তুমি আমাকে বাঁচালে। আমি এতদিন রাক্ষসের জন্যে বেঁচেও মরেছিলাম। আজ আমি মুক্ত হলাম। সবই তোমার জন্যে মহারাজ।

রাজা বললেন কেন তুমি এতদিন এই যন্ত্রণা সহ্য করেছ? তাছাড়া তোমার আসল পরিচয় কি? সব আমাকে বল।

রানী বলল মহারাজ আমি হচ্ছি গন্ধর্বরাজ বিদ্যাধরের মেয়ে, আমার নাম রত্নমঞ্জরী। আমি বাবার খুব আদরের মেয়ে ছিলাম। বাবার খাবার সময় আমাকে কাছে থাকতে হতো। আমি কাছে না থাকলে বাবার খাওয়া ভাল হতো না। একদিন আমি সখীদের সঙ্গে খেলায় এত মেতে উঠলাম যে বাবার খাওয়ার সময় হয়েছে তা একদম ভুলেই গেলাম। বাবা আমার অপেক্ষায় বসে থেকে ক্ষুধায় এত অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন যে রাগে আমাকে অভিশাপ দিলেন তোর বাসস্থান পাতালে হবে আর কৃষ্ণা চতুর্দশীতে এক রাক্ষস এসে নানাভাবে তোকে জ্বালাতন করবে।

এই অভিশাপ পেয়ে আমি খুব কাঁদতে লাগলাম। বাবার পায়ে মাথা কুটতে কুটতে বললাম, বাবা আমার একটু ভুলের জন্যে এত বড় অভিশাপ দিলেন? এখন বলে দিন কিভাবে আমি শাপমুক্ত হব?

বাবা রাগের মাথায় আমাকে অভিশাপ দিয়ে মনে মনে কষ্টই পেলেন। বললেন তোমার শাপমুক্তির উপায় হচ্ছে একজন শক্তিশালী রাজা যেদিন ওই রাক্ষসকে মেরে ফেলবে সেদিনই তুমি শাপমুক্ত হবে। মহারাজ আজ আমি শাপমুক্ত হলাম। এবার যদি অনুমতি দাও তাহলে বাবার কাছে যাব।

রাজা বললেন আমার ইচ্ছে তুমি আমার সঙ্গে রাজধানীতে চল। পরে তোমার বাবার কাছে যাবে।

রত্নমঞ্জরী রাজার ইচ্ছেমতো রাজধানীতে গেল। সেখানে খুব সুখে-শান্তিতে দিন কাটতে লাগল। এবার রাজা রানীকে তার বাবার কাছে যাবার অনুমতি দিলেন। রত্নমঞ্জরী বলল, মহারাজ আমি তো বহুদিন ধরে মানুষের সঙ্গে আছি। তাই আমার

গন্ধর্বত্ব কেটে গেছে। আমার বাবা হচ্ছে গন্ধর্বদের রাজা। আমার মনে হয় এখন বাবার কাছে ফিরে গেলে তেমন স্নেহ ভালবাসা পাব না। এতে আমার কষ্টই বাড়বে। তাই ভাবছি, আমি আর বাবার কাছে ফিরে যাব না।

রাজা রত্নমঞ্জরীর কাছে এই কথা শুনে খুবই খুশি হলেন। কারণ তিনিও মনে মনে চাইছিলেন রানী যাতে বাবার কাছে না যায়। রাজা এবার রাজ্যের সব দায়িত্ব মন্ত্রীর হাতে দিয়ে রানীকে নিয়ে মহা আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন।

মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ রাজার এই আচরণে খুবই কষ্ট পেলেন ও অল্পদিনের মধ্যে মারাও গেলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল বলতো মহারাজ মন্ত্রী কেন মারা গেল?

বিক্রমাদিত্য বললেন রাজা রত্নমঞ্জরীকে কাছে পেয়ে তাঁর সমস্ত দায় দায়িত্ব ভুলে গেছেন। প্রজাদের সুখ-সুবিধে দেখছেন না। নিজের কর্তব্য ভুলে শুধু সুখের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। এই ভাবনা চিন্তা করতে করতে মন্ত্রী মারা গেল। কারণ রাজ্যে কোন কিছু ঘটলে সব দোষ পড়বে গিয়ে মন্ত্রীর উপর।

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে আবার সেই গাছে গিয়ে ঝুলে রইল। রাজা বিক্রমাদিত্য ফের গিয়ে বেতালকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। তারপর শুরু করলো তার দ্বাদশ গল্প।

banglainternet.com

দেবস্বামী ও লাবণ্যবতী

বহুকাল আগে চূড়াপুরে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তার নাম ছিল দেবস্বামী। ব্রাহ্মণ দেবস্বামী দেখতে খুবই সুপুরুষ ছিলেন আর ধনীও ছিল। তার স্ত্রীর নাম ছিল লাবণ্যবতী। দুইজনে খুবই সুখে শান্তিতে জীবন কাটাচ্ছিল।

একদিন গরম কালে ওরা ছাদে বিছানা করে ঘুমাচ্ছিল। সেই সময় এক গন্ধর্ব রথে করে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। লাবণ্যবতীকে দেখে গন্ধর্বের খুব ভাল লাগে, ওকে রথে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। দেবস্বামী ঘুম থেকে উঠে বউকে দেখতে না পেয়ে খুঁজতে থাকে। কিন্তু কোথাও বউকে খুঁজে পেল না। তারপর, দুঃখে সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

একদিন দুপুর বেলা দেবস্বামী ক্ষুধার জ্বালায় এক ব্রাহ্মণ বাড়িতে গিয়ে বলে আমি খুব তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত, আমাকে দয়া করে কিছু খাবার দিন।

গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ দেবস্বামীকে এক বাটি দুধ এনে খেতে দেয়। দেবস্বামী ওই দুধ খেয়ে বিষের জ্বালায় ছটফট করতে থাকে। আর বলে আমাকে কেন তোমরা বিষ খাইয়ে মারলে, এই বলে দেবস্বামী মারা যায়।

দেবস্বামীকে এইভাবে মরতে দেখে ব্রাহ্মণ মনে মনে খুবই কষ্ট পায় ও ব্রাহ্মণীর উপর রেগে যায়। ভাবে এই ব্রাহ্মণীর জন্যেই ব্রাহ্মণ মারা গেল। রাগে দুঃখে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে গালমন্দ করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। আসলে এক বিষধর সাপ মুখ দিয়ে ওই দুধ খেয়েছিল। তাই ওতে বিষ ছিল। এই কথা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কেউই জানতো না। এই গল্প বলে বেতাল বলল মহারাজ বলতো এদের মধ্যে কে দোষী?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন সাপে বিষ আছে এ কথা সত্যি। সাপ দুধে মুখ দিয়েছে তাই দুধ বিষাক্ত হয়েছে। এতে সাপের কোন দোষ নেই। আর ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী এই বিষের কথা জানতো না। তাই তারা দায়ী হতে পারে না। আর দেবস্বামী ছিল ক্ষুধার্ত। তাই সে দুধ পান করেছে।

তবে এই গল্পে দোষী হচ্ছে ব্রাহ্মণ। যে সব কিছু না জেনে নির্দোষ স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে রাজার কাঁধ থেকে নেমে আবার গাছে গিয়ে উঠল। রাজাও ছুটে গিয়ে তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে চলতে লাগলেন। এবার বেতাল তার ত্রয়োদশ গল্প বলতে শুরু করল।

শোভনার নিষ্ঠা

চন্দ্রহৃদয় নগরে রণধীর নামে এক রাজা বাস করতেন। রাজা খুব সৎ ছিলেন। তিনি প্রজাদের খুব ভালবাসতেন। নিয়মকানুনের ব্যাপারে রাজা খুব কঠিন ছিলেন। হঠাৎ তার রাজ্যে চোরের উপদ্রব বেড়ে গেল। প্রজারা সবাই মিলে রাজাকে এই কথা জানাল।

রাজা সব শুনে বললেন যা হয়ে গেছে তার জন্যে দুঃখ করে কোন লাভ নেই। এবার থেকে যাতে চুরি না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন ও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তাদের নিযুক্ত করলেন। রাজা আদেশ দিলেন যদি চোর চুরি করে পালিয়ে যায়, তাহলে প্রহরীর প্রাণদণ্ড হবে।

প্রহরীরা এই আদেশ শুনে খুবই সতর্ক হল। কিন্তু চুরি না কমে বরং আগের চেয়ে বেড়ে গেল।

এবারও প্রজারা রাজার কাছে গিয়ে নিজেদের দুঃখের কথা বলল। রাজা বললেন তিনি আরও কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। এবার রাজা নিজে নগর পাহারার জন্যে বের হলেন। খানিকটা যাবার পর উনি একজন অপরিচিত লোককে দেখে বললেন তোমার পরিচয় কি? এত রাতে তুমি কোথায় যাচ্ছ?

চোর বলল এত রাতে যখন বেরিয়েছি তাহলে বুঝতেই পারছ আমি কে? আমি চুরি করি। চোর রাজাকে বলল, তোমার পরিচয় কি?

রাজা বললেন, বুঝতে পারছ না আমি কে? আমি তোমার মতোই চোর, এই কথা শুনে চোর তো মনে মনে খুব খুশি হল। ভাবল, যাক্ একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। বলল ভালোই হল, চল আমরা দুইজনে মিলে চুরি করতে যাই।

রাজা চোরের কথায় রাজী হলেন। ওরা এক ধনীর ঘরের সবকিছু চুরি করল। তারপর নগরের বাইরে কিছুদূর গিয়ে এক সুড়ঙ্গ পথে পাতালে প্রবেশ করল। চোর রাজাকে বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করতে বলে বাড়িতে ঢুকল।

সেই সময় এক দাসী রাজাকে চিনতে পেরে বলে মহারাজ আপনি এখান থেকে পালান, এই চোর এক ভয়ঙ্কর দস্যু। এই কথা শুনে রাজা বললেন আমি তো বেরনোর পথ জানি না। যদি তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে দাও তাহলে বাঁচতে পারি। ওই দাসীই রাজাকে বাইরে বের করে দিল।

পরদিন রাজা প্রচুর সৈন্যসামন্ত নিয়ে পাতালে প্রবেশ করে চোরের বাড়ির চারদিক থেকে ঘিরে ফেললেন। এক রাক্ষস এই পাতাল নগরীকে রক্ষা করতো। চোর ওই রাক্ষসকে বলল, হয় তুমি আমাকে বাঁচাও নয়তো পালিয়ে যাও। চোর ওই রাক্ষকে

banglainternet.com

অনেক উপহার দিল। রাক্ষস বলল কোন ভয় নেই, আমি এক্ষুণি রাজার সৈন্যসামন্ত সব খেয়ে শেষ করে দিচ্ছি। এই বলে রাক্ষস রাজার সৈন্য সামন্ত হাতি ঘোড়া সব খেতে শুরু করল। এই অবস্থা দেখে সৈন্যরা সব পালিয়ে গেল। এমনকি রাজাও পালাতে আরম্ভ করলেন। চোর রাজার পিছু পিছু গিয়ে বলল, ছিঃ তুমি রাজা হয়ে এত কাপুরুষ। যুদ্ধ না করে পালিয়ে যাচ্ছ। তোমার মতো রাজার নরক বাস হবে।

রাজা এই কথা শুনে লজ্জায় অপমানে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। শেষে রাজা চোরকে পরাজিত করে তাকে বেঁধে রাজধানীতে নিয়ে এলেন। রাজা তাকে শূলে চড়াতে বললেন। এদিকে ধর্মধ্বজ বণিকের মেয়ে শোভনা চোরকে দেখে এত মুগ্ধ হল যে তাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে উঠল। বাবাকে বলল বাবা ওই চোরকে মুক্ত করে আমার সঙ্গে ওর বিয়ে দাও।

বণিক ধর্মধ্বজ বলল, তা কি হয় মা? রাজা এই কথায় কখনও রাজী হবেন না। এই চোরকে ধরার জন্যে অনেক সৈন্য সামন্ত মারা গেছে, তাছাড়া রাজাকেও মেরে ফেলতে চেয়েছিল এই চোর। কি করে এই চোরকে আমি মুক্ত করবো।

শোভনা বলল তোমার সব ধনসম্পত্তি দিয়ে ওকে মুক্ত কর। যদি ওকে মুক্ত করে আনতে না পার তাহলে আমি বাঁচব না। তোমার সামনেই প্রাণত্যাগ করবো।

ধর্মধ্বজ মেয়েকে খুব ভালবাসতেন। তাই রাজার কাছে গিয়ে বলল মহারাজ আমার সব ধনসম্পত্তি নিয়ে এই চোরকে ছেড়ে দিন। এই কথা শুনেও রাজা চোরকে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। বললেন এই চোর আমার প্রজাদের প্রচুর ক্ষতি করেছে। আমার সৈন্য-সামন্তদের ওর জন্যে প্রাণ দিতে হয়েছে। এমনকি ও আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে। আমি ওই চোরকে কিছুতেই ছাড়বো না।

ধর্মধ্বজ মেয়েকে গিয়ে সব কথা বলল। সব শুনে মেয়ে কাঁদতে লাগল।

এদিকে তো শোভনার কথা রাজ্যের সবাই জেনে ফেলেছে। চোরকে শূলস্তম্ভের কাছে আনা হল। চোরও এই শোভনার কথা শুনে প্রথমে হাসল, তারপর কাঁদল। তারপর ওকে শূলে চড়ানো হল। শোভনা চোরের মৃত্যুর খবর পেয়ে চোরের সঙ্গে একই চিতায় মরার জন্যে চলল।

এই চিতার পাশেই দেবী কাত্যায়নীর মন্দির ছিল। দেবী শোভনার নিষ্ঠা দেখে শোভনার কাছে গিয়ে বললেন, তোমার নিষ্ঠা দেখে আমি খুশি হয়েছি। কি বর চাও বল? শোভনা বলল, দেবী যদি আমাকে কৃপা কর তাহলে এই চোরকে জীবনদান কর। দেবী তাই করলেন। অমৃত পান করিয়ে চোরকে ফের বাঁচিয়ে তুললেন।

বেতাল গল্প শেষ করে বলল, মহারাজ বলতো চোর কেন প্রথমে হেসেছিল ও পরে কেন কেঁদেছিল?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন প্রথমে চোরের মনে হয়েছিল আমি যখন মরতে যাচ্ছি তখন ওই মেয়েটা আমাকে বিয়ে করতে চাইছে। তারপর কেঁদেছিল কারণ চোরটা ভাবল ওই মেয়েটা তার সবকিছু দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তার জন্যে কিছুই করতে পারলাম না, এই অনুশোচনায় দুঃখে চোরটা কেঁদেছিল।

ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল শ্মশানে গিয়ে সেই গাছে চড়ে বসল আর বিক্রমাদিত্য গিয়ে তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে চলতে লাগল। তারপর বেতাল তার চতুর্দশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।

চতুর্দশ গল্প

চন্দ্রপ্রভা ও মনস্বী

সেকালে কুসুমবতী নগরে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল সুবিচার। রাজার কন্যার নাম ছিল চন্দ্রপ্রভা। একদিন চন্দ্রপ্রভা উপবনে সখীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেই উপবনে মনস্বী নামে একজন রূপবান ব্রাহ্মণকুমার ক্লান্ত হয়ে গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। রাজকুমারী ও তার সখীরা সেই ব্রাহ্মণকুমারের সামনে যেতেই তাদের পায়ের শব্দে ব্রাহ্মণকুমার জেগে গেল। ব্রাহ্মণকুমারের রূপ দেখে রাজকুমারী মুগ্ধ হয়ে গেল। ব্রাহ্মণকুমারও রাজকুমারীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। সখীদের সাথে রাজকুমারী ফিরে গেল রাজপ্রাসাদে।

ব্রাহ্মণকুমার নিদারুন হতাশায় ঐখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সেই সময় ওই পথ দিয়ে শশী ও ভূদেব নামে দুই পথিক যাচ্ছিল। ওরা দুইজন কামরূপ থেকে শিক্ষালাভ করে দেশে ফিরছিল। ওরা দুইজনে ব্রাহ্মণকুমারকে জলের ঝাপ্টা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল তোমার কি হয়েছে?

ব্রাহ্মণকুমার তার দুঃখের কথা সবই খুলে বলল। রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভাকে বিয়ে করতে না পারলে আমি বাঁচব না।

ভূদেব বলল তোমার দুঃখ আমি দূর করবোই। তুমি যাতে রাজকুমারীকে বিয়ে করতে পার তার ব্যবস্থা করবো। এবার আমাদের সঙ্গে চল।

বাড়িতে গিয়ে ভূদেব মনস্বীকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বলল এই মন্ত্রের এমন গুণ যে এই মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তুমি এক যুবতীতে পরিণত হবে। আবার ইচ্ছে করলেই নিজের ষোল বছরের স্বরূপ প্রাপ্ত হবে। মনস্বী মন্ত্রবলে ষোল বছরের এক মেয়ে হলেন। আর ভূদেব হল আশি বছরের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। মনস্বীকে পুত্রবধূ সাজিয়ে রাজা সুবিচারের কাছে গেল। রাজা ওদের দেখে উঠে এসে খুব সম্মানের সঙ্গে বসতে দিলেন; বললেন কোথা থেকে এসেছেন?

ব্রাহ্মণবেশী ভূদেব বলল মহারাজ এ হচ্ছে আমার পুত্রবধূ, একে বাপের বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখছি গ্রামে ওলাওঠা রোগ ছেয়ে গেছে। আমার স্ত্রী আর ছেলে গ্রাম থেকে চলে গেছে। তারা কোথায় আছে কে জানে? আমি ওদের খুঁজতে বের হব। তাই ভাবছি আপনি যদি দয়া করে আমার পুত্রবধূকে ঠাঁই দেন তাহলে আমি ধন্য হব। পুত্রবধূকে বিশ্বস্ত লোকের হাতে না দিয়ে গেলে আমি বিদেশে গিয়েও শান্তি

banglainternet.com

পাব না। তাই অনুরোধ করছি মহারাজ আমার পুত্রবধূকে আশ্রয় দিন ও আপনার মেয়ের সঙ্গে অন্তঃপুরে রাখুন। আমি ফিরে এসে আমার পুত্রবধূকে নিয়ে যাব।

রাজা সব শুনে বললেন আমি আপনার প্রস্তাবে রাজী। তাছাড়া এটাতো আমার কর্তব্য।

ভূদেব রাজার কথা শুনে পুত্রবধূকে রাজার হাতে দিয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেল।

এদিকে রাজকন্যাও তার সঙ্গী পেয়ে খুব খুশি। ওদের দুইজনের খুব ভাব হয়ে গেল। ওরা একসঙ্গে থাকে, এক জায়গায় ঘুমায়। এইভাবে দুইজন দুইজনকে খুব ভালবেসে ফেলল।

একদিন ছদ্মবেশী মনস্বী রাজকন্যাকে বলল সখী তুমি সারাদিন কার কথা ভাব? আমাকে তোমার মনের সব কথা বল।

এই কথায় রাজকন্যা সব কথা মনস্বীকে খুলে বলল। মনস্বী বলল আচ্ছা সখী যদি আমি তোমার সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণ কুমারের দেখা করিয়ে দিই, তাহলে আমাকে তুমি কি পুরস্কার দেবে?

রাজকন্যা তো এই কথা শুনে আনন্দে আহ্লাদে নেচে উঠল। বলল যদি সত্যিই তুমি আমার সাথে সেই ব্রাহ্মণ কুমারকে মিলন করিয়ে দিতে পার তাহলে আমি তোমার দাসী হয়ে থাকবো।

মনস্বী মন্ত্রবলে ব্রাহ্মণকুমার হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে তো রাজকন্যা অবাক হয়ে গেল ও সব কথা জানতে চাইল।

মনস্বী রাজকন্যাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল ও ওদের দুইজনের গন্ধর্বমতে বিয়ে হয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যে রাজকন্যার গর্ভে সন্তান এল।

একদিন রাজা সুবিচার তাঁর মন্ত্রীর বাড়িতে নিমন্ত্রণে গেলেন। সেখানে রাজকন্যারও নিমন্ত্রণ ছিল। রাজকন্যা ব্রাহ্মণকুমারকে চোখের আড়াল করতে চাইত না। তাই তাকেও সঙ্গে করে মন্ত্রীর বাড়িতে নিমন্ত্রণে গেল। এদিকে মন্ত্রীর ছেলের তো ছদ্মবেশী মনস্বীকে দেখে খুব ভাল লেগে গেল। সে বধূরূপী মনস্বীকে বিয়ে করার জন্যে তার বন্ধুকে বলল আমি এই ব্রাহ্মণ বধূকে বিয়ে করতে চাই। ওকে বিয়ে করতে না পারলে আমি এই জীবন রাখব না।

বন্ধু এই কথা মন্ত্রীকে বলল, মন্ত্রী দেখল তার ছেলের শরীর ও মন ভেঙে যাচ্ছে। তাই সে রাজাকে গিয়ে সব কথা খুলে বলল।

রাজা মন্ত্রীর কথা শুনে খুবই ক্ষেপে গেলেন। বললেন এটা কি করে সম্ভব? এক ব্রাহ্মণ তার পুত্রবধূকে বিশ্বাস করে আমার কাছে রেখে গেছেন। তার অনুমতি ছাড়া এই কাজ কিভাবে করবো? আপনার এই অনুরোধ আমি রাখতে পারবো না। আমার প্রাণের বিনিময়েও তা সম্ভব নয়।

মন্ত্রী নিরাশ হয়ে বাড়িতে ফিরলো। ছেলের অবস্থা দেখে নিজেও খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিল।

এদিকে মন্ত্রী ছাড়া রাজকার্য চলে না। রাজসভায় সভাসদরা রাজাকে বলল মহারাজ মন্ত্রীপুত্রের যা অবস্থা তাতে মনে হয় মন্ত্রীপুত্র আর বাঁচবে না। পুত্র মারা গেলে মন্ত্রীও

আর বাঁচবে না। এই মন্ত্রী খুবই জ্ঞানী ও বিচক্ষণ। এই মন্ত্রী যদি মারা যায় তাহলে রাজ্যে শৃঙ্খলা বলে কিছুই থাকবে না। তাই আপনার উচিত ব্রাহ্মণবধূকে মন্ত্রী গৃহে পাঠিয়ে দেওয়া। তাছাড়া ব্রাহ্মণ তো অনেকদিন হল দেশ ছাড়া। হয়তো আর ফিরবেও না। যদি ফেরে তাহলে তাকে ধনরত্ন দিলে আর আপত্তি করবে না।

রাজা অনেক ভেবেচিন্তে ব্রাহ্মণবধূকে মন্ত্রীপুত্রের কথা সব বললেন।

মনস্বী বলল মহারাজ আপনি হচ্ছেন দেশের রাজা। আপনার যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। আমি আপনার আশ্রিতা। আপনার আদেশ পালন করা আমার কর্তব্য। আপনি যদি সুবিবেচক হন তাহলে বলুন কোন বিবাহিতা নারী কি করে আর একবার বিয়ে করে? আপনি রাজা হয়ে আমাকে কিভাবে এই অন্যায় কাজ করতে বলছেন? আমি কিছুতেই আপনার আদেশ পালন করতে পারবো না। রাজা খুবই দুঃখিত মনে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এলেন।

মনস্বী ভাবতে লাগল আমার আর এখানে থাকা উচিত হবে না। এই ভেবে সে মন্ত্রবলে ফের ব্রাহ্মণকুমার হয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেল। মনস্বী সোজা গিয়ে হাজির হল ভূদেবের বাড়িতে। ভূদেব সব শুনে, মনে মনে খুবই খুশি হল। বলল কোন চিন্তা করতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করবো।

এদিকে ব্রাহ্মণবধূকে আর অন্তঃপুরে পাওয়া যাচ্ছে না, এই খবর শুনে রাজাতো খুব চিন্তায় পড়লেন। ভাবলেন এখন কি উপায় হবে? যখন ব্রাহ্মণ এসে তার পুত্রবধূকে ফেরত চাইবে তখন? ভাবলেন ব্রাহ্মণ বধূকে কথাটা না বলাই ভাল ছিল।

ভূদেব তার বন্ধুকে মন্ত্রবলে এক যুবক সাজিয়ে, আর নিজে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেজে রাজসভায় এল। পুত্রবধূকে ফেরত চাইল। বলল এই আমার ছেলে। এবার পুত্রবধূকে নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরবো।

রাজাতো ব্রহ্মশাপের ভয়ে সব কথাই ব্রাহ্মণকে খুলে বললেন।

ব্রাহ্মণবেশী ভূদেব এই কথা শুনে খুব ক্ষেপে গিয়ে বলল, এটা কি রাজার কাজ হয়েছে? আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা?

রাজা অনেক অনুনয় বিনয় করে বললেন—আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার যা ক্ষতি হয়েছে, তার জন্যে আপনি কি চান বলুন?

ভূদেব বলল—যদি আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেন তাহলেই আপনার কথা রাখা হবে। রাজা নিরুপায় হয়ে নিজের মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণবেশী শশীর বিয়ে দেন। সুদিন দেখে ভূদেব রাজকন্যাকে নিয়ে বাড়িতে গেল। শশী আর মনস্বীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেল। দুইজনেই রাজকন্যাকে নিজের স্ত্রী বলে দাবী করতে লাগল। মনস্বী বলল আমি গন্ধর্ব মতে রাজকন্যাকে বিয়ে করেছি। তাছাড়া আমার সন্তান ওর গর্ভে।

আর শশী বলল—আমার সাথে রাজা নিজের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। এই বিয়ে বৈধ। তাই রাজকন্যা আমারই স্ত্রী হবে।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল—বলুনতো মহারাজ, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে রাজকন্যা কার স্ত্রী হবে?

banglainternet.com

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—এটা খুবই সোজা উত্তর। রাজকন্যা মনস্বীর স্ত্রী হবে।

বেতাল বলল—রাজা সবার সামনে কন্যাকে শশীর হাতে দান করেছেন, সেখানে মনস্বী কিভাবে দাবীদার হবে?

রাজা বললেন—মনস্বী আগেই রাজকন্যাকে বিয়ে করেছেন। তাছাড়া ওর সন্তান রাজকন্যার গর্ভে। সে ক্ষেত্রে রাজকন্যার মনস্বীর স্ত্রী হওয়া শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসংগত।

বেতাল এই উত্তর শুনে খুশি হয়ে ফের গাছে গিয়ে উঠল। আর রাজা তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে চলতে লাগলেন। এবার বেতাল তার পঞ্চদশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।

পঞ্চদশ গল্প

জীমূতবাহন ও শঙ্খচূড়

বহু যুগ আগে হিমালয়ের কোলে পুষ্পশর নামে এক নগর ছিল। জীমূতকেতু নামে এক রাজা সেখানে রাজত্ব করতেন। রাজার কোন সন্তান ছিল না। অনেকদিন কল্পবৃক্ষের আরাধনা করে তাঁর একটি ছেলে হল। ছেলের নাম রাখা হল জীমূতবাহন। ছেলে খুবই ধর্মপ্রাণ, দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাছাড়া রাজকুমার অস্ত্র বিদ্যায় ও শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

জীমূতকেতু কল্পবৃক্ষের আরাধনা করে রাজ্যের প্রজাদের জন্যে সব রকম সুখ-সম্পদ চেয়ে নিলেন। এতে রাজ্যের ক্ষতিই হল। কারণ প্রজারা প্রচুর ধনসম্পত্তি হাতে পেয়ে খুব কুঁড়ে ও অহংকারী হয়ে উঠল। রাজাকে তখন তারা মানতে চাইল না। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তাছাড়া রাজার আত্মীয় স্বজনরা বলল—রাজা ও রাজপুত্র দুইজনেই সবসময় ধর্ম নিয়ে থাকে, এতে দেশের ক্ষতি হচ্ছে। তাই রাজাকে সরিয়ে সেখানে অন্য একজনকে রাজা করা উচিত। যার ফলে প্রজারা বিদ্রোহ করতে লাগল। ওরা বুঝল রাজা প্রজাদের জন্যে ভাবনা চিন্তা করে না। তাই ওঁকে সরানো উচিত। প্রজারা রাজপ্রাসাদ ঘিরে বিদ্রোহ করতে লাগল।

রাজা জীমূতকেতু কোন প্রতিবাদ করলেন না। ভাবলেন প্রতিবাদ করা মানেই যুদ্ধ করা। এতে মৃতের সংখ্যাই বাড়বে। তারচেয়ে এই রাজপ্রাসাদ ছেড়ে হিমালয়ের শান্ত কোন জায়গায় কুঁড়েঘর তৈরি করে দেবতার আরাধনা করা অনেক শান্তির। সত্যিই রাজা তাঁর পরিবার নিয়ে হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন।

রাজকুমার জীমূতবাহনের সঙ্গে হিমালয়ের এক ঋষিকুমারের খুব বন্ধুত্ব হল। একদিন দুই বন্ধুতে বেড়াতে বেড়াতে কাত্যায়নীর মন্দিরের সামনে এসে শুনতে পেল মন্দিরের ভিতর থেকে বীণার সুর ভেসে আসছে। ওরা দুইজনে মন্দিরে প্রবেশ করে অবাক হয়ে গেল। দেখতে পেল এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে বীণা বাজিয়ে দেবী কাত্যায়নীর স্তবগান করছে। ওরা মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল। গান শেষ করে জীমূতবাহনকে দেখে মেয়েটির খুব ভাল লাগল। মনে মনে তাকে বিয়ে করার কথাও ভাবল। মেয়েটি হলো মলয় রাজের কন্যা মলয়বতী।

মেয়েটির মা সব শুনে তার স্বামী মলয়কেতুকে বলল। আবার মলয়কেতু তার ছেলে মিত্রবসুকে ডেকে বলল—আমি জীমূতকেতুর ছেলে জীমূতবাহনের সঙ্গে তোমার বোনের

banglainternet.com

বিয়ে দেব। তুমি গিয়ে জীমূতকেতুকে সব বল। জীমূতকেতু এই প্রস্তাবে খুব খুশি হলেন ও কিছুদিনের মধ্যে জীমূতবাহনের সাথে মলয়বতীর বিয়ে দিলেন।

একদিন জীমূতবাহন তার শ্যালক মিত্রবসুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড সাদা ঢিবি দেখতে পান। জানতে চান ওটা কি? মিত্রবসু বলে ওটা হচ্ছে মৃত নাগের হাড়ের পাহাড়। এক সময় গরুড়ের সঙ্গে নাগের ভীষণ যুদ্ধ হয়। তাতে নাগেরা পরাজিত হয়ে গরুড়ের কাছে সন্ধির প্রার্থনা করে। গরুড় বলে ঠিক আছে, সন্ধি করতে পারি যদি তোমরা আমার আহারের জন্যে প্রতিদিন একটা করে নাগ পাঠাও। তাহলে তোমাদের অন্য কাউকে খাব না।

নাগেরা নিরুপায় হয়ে গরুড়ের প্রস্তাব মেনে নেয়। সেই থেকে গরুড়ের আহারের সময় একটা করে নাগ হাজির হয়। গরুড় ওই নাগকে খেয়ে চলে যায়। ওদের হাড় জমে জমে এই পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে।

জীমূতবাহন এইসব কথা শুনে খুব কষ্ট পেল। ভাবল এই দুপুরে নিশ্চয় কোন নাগ গরুড়ের কাছে খাদ্য হিসেবে এসেছে, আমি আমার জীবন দিয়ে ওই নাগকে বাঁচাতে পারি। এই ভেবে জীমূতবাহন মিত্রবসুকে বিদায় দিয়ে নিজে গিয়ে হাজির হল। খানিকটা যাবার পর দেখল এক বৃদ্ধা নাগী কপাল চাপড়ে কাঁদছে। জীমূতবাহন বললেন কেন কাঁদছ মা? বৃদ্ধা নাগী বলল, আজ আমার একমাত্র ছেলে শঙ্খচূড়ের পালা। কিছুক্ষণ পর গরুড় এসে ওকে খেয়ে ফেলবে। শঙ্খচূড় ছাড়া আমার আর কোন সন্তান নেই। সেই দুঃখেই কেঁদে মরছি বাছা।

জীমূতবাহন বললেন তুমি কেঁদ না মা। আমি আমার প্রাণ দিয়ে তোমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা করবো।

এই কথা শুনে বৃদ্ধা নাগী বলল—না বাছা তা হয় না। অন্যের ছেলের জন্যে তুমি কেন প্রাণ দেবে? আমিতো তোমাকে মরতে দিতে পারি না। এটা আমার অন্যায় হবে বাছা। ওদের কথার মধ্যে শঙ্খচূড় এসে হাজির হল। সব শুনে বলল—না মহারাজ তা হতে পারে না। আপনি হচ্ছেন একজন ধার্মিক ও দয়ালু মানুষ। আপনার বাঁচা দরকার। আমার মতো তুচ্ছ জীবের প্রাণ গেলে কোন ক্ষতি হবে না। আপনি বেঁচে থাকলে অনেক উপকার হবে।

জীমূতবাহন বললেন—আমি যে কথা দিয়েছি তোমার প্রাণ বাঁচাব। তাছাড়া আমি ক্ষত্রিয়। আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারি না। তুমি চলে যাও। শঙ্খচূড়কে বিদায় দিয়ে জীমূতবাহন গরুড়ের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এদিকে শঙ্খচূড় দুঃখে কাতর হয়ে দেবী কাত্যায়নীর কাছে প্রার্থনা করতে লাগল। দেবীর কাছে সে জীমূতবাহনের প্রাণ ভিক্ষা চাইল।

ঠিক সময়ে গরুড় এসে যুবরাজকে ঠোঁটে তুলে নিয়ে আকাশে উড়তে লাগল। কিছু সময় পর জীমূতবাহনের রক্তমাখা আংটিটা মলয়বতীর সামনে এসে পড়ল। এই আংটি দেখে সবাই চিনতে পারল যে তা জীমূতবাহনের আংটি। তখন সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। শ্বশুর মলয়কেতু ছেলেকে সঙ্গে করে জামাইকে খুঁজতে বের হলো।

এদিকে শঙ্খচূড় জীমূতবাহনের খবর জেনে সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল—হে বিহঙ্গরাজ, তুমি যাকে খাবে বলে নিয়ে গেছ সে তোমার

খাবার নয়। সে হচ্ছে ধর্মপ্রাণ জীমূতবাহন। তুমি তাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে আহার কর। তুমি যদি ওকে খাও তাহলে এটা হবে তোমার অধর্ম।

এই কথা শুনে গরুড় দেখল সত্যিইতো এতো নাগ নয়, তবে একে কেন খাব? এই কথা শুনে গরুড় জীমূতবাহনের কাছে সমস্ত কথা জেনে বলল—সবাই নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায় আর তুমি অন্যকে বাঁচাবার জন্যে নিজের প্রাণ দিচ্ছ কেন?

জীমূতবাহন বললেন—এই পৃথিবীতে সবাইকেই তো মরতে হবে, কেউ আগে যাবে আর কেউ পরে। দুইদিন আগে মরে যদি কারও উপকার করতে পারি তাহলে নিজেকে ধন্য মনে হবে। যার জন্যে আমি নিজের জীবন দিয়ে শঙ্খচূড়কে বাঁচাতে চাই।

গরুড় এই কথা শুনে বলল—তোমার মতো এইরকম ধর্মপ্রাণ আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা কর।

জীমূতবাহন বললেন—ঠিক আছে, আগে প্রতিজ্ঞা করুন আজ থেকে কোন নাগ খাবেন না। আর যাদের এতদিন ধরে খেয়েছেন তাদের প্রাণ ফিরিয়ে দেবেন।

গরুড় সব কথায় রাজী হল। পাতালে গিয়ে অমৃত এনে মৃত নাগদের হাড়ের উপর ছিটিয়ে দিল। মৃত নাগেরা বেঁচে উঠল। গরুড় ফের বলল—রাজকুমার আমার আশীর্বাদে তুমি রাজ্য ফিরে পাবে। এই খবর শুনে সবাই খুশি হল। প্রজারা এসে জীমূতকেতুর কাছে ক্ষমা চাইল। তারা রাজাকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

বেতাল এবার বলল—বলতো মহারাজ এই গল্পে জীমূতবাহন ও শঙ্খচূড় এই দুইজনের মধ্যে কে বেশি মহৎ? বিক্রমাদিত্য কোন চিন্তা না করেই বললেন শঙ্খচূড় মহৎ। কারণ শঙ্খচূড় প্রথম থেকেই জীমূতবাহনকে বারণ করেছে, বারবার তাকে সাবধান করেছে। যখন তাকে কিছুতেই থামাতে পারেনি, তখন সে কাত্যায়নী দেবীর কাছে এসে মঙ্গল প্রার্থনা করল। পরে গরুড়ের কাছে এসে জীমূতবাহনের জীবন ভিক্ষা করে নিজে জীবন দিতে চাইল।

বেতাল সব শুনে বলল—যে পরের জন্যে প্রাণ দিতে গেল সে মহৎ হল না কেন?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—জীমূতবাহন হচ্ছে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের কাছে প্রাণ খুবই তুচ্ছ। তাই জীমূতবাহনের জায়গায় যে কোন ক্ষত্রিয়ই এই কাজ করতো।

উত্তর শুনে বেতাল রাজার কাঁধ থেকে নেমে গাছে গিয়ে উঠল। আর রাজাও তার পিছু পিছু গিয়ে তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে চাপিয়ে পথ চলতে লাগলেন। এবার বেতাল তার ষোড়শ গল্প বলতে শুরু করল।

banglainternet.com

ষোড়শ গল্প

রাজার মহত্ত্ব

সেকালে চন্দ্রশেখর নগরে রত্নদত্ত নামে এক বণিক বাস করতো। তার এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা ছিল, যাকে দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। এই মেয়েটির নাম ছিল উন্মাদিনী। বণিক জানতো তার মেয়ে রাজরানী হবার যোগ্য। তাই মেয়েকে বিয়ে দেবার জন্যে দেশের রাজার কাছে গিয়ে প্রস্তাব করল।

মেয়েটিকে দেখার জন্যে রাজা মন্ত্রীদের পাঠালেন। মন্ত্রীরা উন্মাদিনীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা নিজেরা আলোচনা করল এমন সুন্দরী মেয়েকে যদি রাজামশায় বিয়ে করেন, তাহলে রাজকার্যে মন দেবেন না। প্রজাদের কথা ভাববেন না। দিনরাত্রি অন্তঃপুরেই কাটাবেন। তখন কি হবে? এইসব সাতপাঁচ ভেবে মন্ত্রীরা রাজার কাছে গিয়ে বলল—এই মেয়ে মোটেই রানী হবার যোগ্য নয়।

রাজা এই বিয়েতে অমত করায়, রত্নদত্ত সেনাপতি বলভদ্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেন।

বিয়ে হবার পর ওরা সুখে শান্তিতেই ঘর সংসার করছিল। তবে উন্মাদিনীর মনে একটা জ্বালা ছিল। কারণ রাজা তাকে অশুভ লক্ষণের জন্যে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। রাজা তাকে অপমান করেছেন। এর প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে।

একদিন রাজা হাতি চড়ে নগরের উৎসব দেখতে বেরুলেন। সেই সময় উন্মাদিনী নিজের বাড়ির ছাদে উঠে দাঁড়াল। উন্মাদিনীর মনে আছে সেই অপমানের কথা। তাই নিজের রূপ দেখাতে চাইল। রাজার হাতি উন্মাদিনীর বাড়ির সামনে আসতেই রাজার নজর পড়ল। উনি দেখতে পেলেন উন্মাদিনীকে। উন্মাদিনীর রূপ দেখে রাজা সব ভুলে গেলেন, এক দৃষ্টে দেখতে লাগলেন উন্মাদিনীকে।

রাজা প্রাসাদে ফিরে সব কথাই জানতে পারলেন। যে মন্ত্রীরা তাকে এই উন্মাদিনীর নামে মিথ্যে কথা বলেছিল, তাদের তিনি রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এবার উন্মাদিনীকে কাছে পাবার জন্যে রাজা দিনরাত ভাবতে লাগলেন। অনেকেই রাজাকে বললেন আপনি ইচ্ছা করলে উন্মাদিনীকে এখনই পেতে পারেন। কিন্তু রাজা ভীষণ ধর্মভীরু ছিলেন। তাই কিছুতেই তাদের কথায় রাজী হলেন না।

এদিকে সেনাপতি বলভদ্রও কথাটা জানতে পারল। সে সত্যিই রাজভক্ত। রাজার কাছে এসে বলল, মহারাজ আপনি আমার স্ত্রীকে আপনার দাসীরূপে গ্রহণ করুন। আমি

আমার স্ত্রীকে আপনাকে দান করছি। এতে কোন দোষ নেই। এতেও যদি আপনার আপত্তি থাকে তাহলে আমি তাকে দেবালয়ে নিয়ে গিয়ে ত্যাগ করছি। তাহলে আর কোন পাপই হবে না।

সেনাপতির কথা শুনে রাজা বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি রাজা হয়ে এই অন্যায় কেমন করে করবো? তাহলে কি আর কেউ ন্যায় পথে চলতে চাইবে? তাছাড়া তুমি আমাকে দিয়ে এমন অন্যায় কাজ করাতে চাইছ কেন? আর শোন, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ কর তাহলে তোমাকে আমি শাস্তি দেব। রাজা মনে মনে উন্মাদিনীকে কাছে পেতে চাইলেও অন্যায় ভাবে পেতে চাননি। তাই উন্মাদিনীর চিন্তায় শেষে প্রাণ ত্যাগ করলেন। রাজা মারা গেলেও তার সুনাম রয়ে গেল। তাঁর মৃত্যুতে সেনাপতি বলভদ্রও প্রাণত্যাগ করল।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল—বলতো মহারাজ, এই রাজা আর সেনাপতির মধ্যে কার মহত্ত্ব বেশি? আমার মতে কিন্তু সেনাপতিই মহৎ, কারণ সেনাপতি তার নিজের প্রিয় স্ত্রীকে রাজাকে দান করতে চেয়েছে। এটা কি মহত্ত্ব নয়?

রাজা বিক্রমাদিত্য বেতালের কথা শুনে একটু হেসে বললেন, সেনাপতিরা সবসময়ই রাজভক্ত হয়। প্রভুর জন্যে তারা জীবনও দেয়। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কিন্তু রাজা ইচ্ছে করলেই সব পেতে পারেন, তাঁকে বাঁধা দেবার কেউ নেই। কিন্তু এখানে রাজা তা মোটেই করেন নি। অন্যায় অধর্ম তিনি না করে বরং নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাই রাজাই এই গল্পে মহৎ ব্যক্তি।

বেতাল সঠিক উত্তর শুনে সোজা গাছে গিয়ে উঠল। আর রাজাও তাকে গাছ থেকে নামিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

এবার বেতাল তার সপ্তদশ গল্প বলতে শুরু করল।

banglainternet.com

সপ্তদশ গল্প

একাগ্রতার অভাব

সেকালে হেমকূট নামক এক রাজ্যে বিষ্ণুশর্মা নামে এক পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস করত। তার এক ছেলে ছিল। ছেলেটির নাম ছিল গুণাকর। ছেলেটির জুয়া খেলার নেশার জন্যে সে বাবার জমানো টাকা পয়সা সব কিছু নষ্ট করে ফেলে। টাকার জন্যে ছেলেটি চুরিও করতে আরম্ভ করে। বিষ্ণুশর্মা লজ্জায় অপমানে চোর ছেলেকে তাড়িয়ে দিল।

গুণাকর নানা দেশ ঘুরে এসে হাজির হল এক শ্মশানে। সেখানে দেখল এক সন্ন্যাসী যোগাভ্যাস করছেন। গুণাকর সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সন্ন্যাসী বুঝলেন ছেলেটি ক্ষুধার্ত। তাকে একটা মড়ার খুলিতে করে অনেক কিছু খেতে দিলেন। কিন্তু গুণাকর তা খেতে মোটেই রাজী হল না। তখন সন্ন্যাসী যোগাসনে বসে চোখ বুঁজলেন, সামনে এসে হাজির হল এক যক্ষকন্যা। যক্ষকন্যা এসে বলল—আদেশ করুন প্রভু, কি করবো?

সন্ন্যাসী বললেন এই ব্রাহ্মণ খুবই ক্ষুধার্ত। তার খাবারের ব্যবস্থা কর।

এই আদেশ পাওয়ামাত্র যক্ষকন্যার মায়াবলে এক প্রাসাদ তৈরি হল। সে ব্রাহ্মণকে ওই প্রাসাদে নিয়ে নানা রকম খাবার খাওয়াল। তারপর তাকে এক মণিমুক্তা খচিত পালঙ্কে শুতে দিয়ে সে গুণাকরের পদসেবা করতে লাগল। গুণাকর মহানন্দে রাতটা কাটাল। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল ও সব কিছুই নেই। তখন সে খুবই অবাক হয়ে গেল। সন্ন্যাসীকে গিয়ে এ সবের রহস্য কি তা জিজ্ঞেস করল।

সন্ন্যাসী বললেন—যক্ষকন্যা যোগবিদ্যার প্রভাবে এসেছিল। যে লোক যোগবিদ্যা জানে না যক্ষকন্যা তার কাছে থাকে না।

এই কথা শুনে গুণাকর সন্ন্যাসীর পা জড়িয়ে ধরে বলল, প্রভু আমাকে এই বিদ্যা শিখিয়ে দিন।

সন্ন্যাসী গুণাকরকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন, যাও চল্লিশদিন মাঝরাতে গলা অবধি ঠাণ্ডা জলে ডুবে থেকে একমনে এই মন্ত্র জপ করবে।

গুণাকর সন্ন্যাসীর কথামতো তাই করল। তারপর সন্ন্যাসীর কাছে এসে বলল প্রভু আমি আপনার কথামতো সবই করেছি। এবার বলুন আর কি করতে হবে?

সন্ন্যাসী বললেন—এবার চল্লিশ দিন জ্বলন্ত আগুনে দাঁড়িয়ে এই মন্ত্র জপ করলেই তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ হবে।

গুণাকর বলল প্রভু অনেকদিন হল বাবা-মাকে দেখি না, আগে বাবা-মাকে দেখে আসি। তারপর এটা করবো।

গুণাকর সন্ন্যাসীর অনুমতি নিয়ে বাবা-মার কাছে গেল। বাবা-মাতো ছেলেকে এতোদিন পর পেয়ে খুবই খুশি হল। ছেলে বাবা-মাকে সব কথাই বলল। মা দুঃখ করে বলল এই বয়সে কেউ যোগভ্যাস করে? এখন তোমার সংসার ধর্ম করা উচিত। বুড়ো বাবা-মাকে দেখা উচিত।

গুণাকর বাবা-মার কথা মোটেই শুনল না। বরং বলল এই পৃথিবীতে কেউ কারও নয়। আমি যে পথ বেছে নিয়েছি, সে পথেই চলব। সে বাবা-মার কোন বাধা মানল না, সোজা সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে হাজির হল।

সন্ন্যাসীর কথামতো আগুনে দাঁড়িয়ে চল্লিশ দিন মন্ত্রপাঠ করল। কিন্তু কোন ফলই হল না।

বেতাল গল্প শেষ করে বললে, বলতো মহারাজ কেন ব্রাহ্মণ যুবক সবকিছু করেও সিদ্ধ লাভ করতে পারল না?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—একাগ্রচিত্ত না থাকলে কোন কাজই সফল হয় না। এখানে ব্রাহ্মণের নিষ্ঠার অভাব ছিল। যদি তার একাগ্রতা থাকতো তাহলে বাবা-মাকে দেখার জন্যে মাঝখানে যেত না। কারণ ওর মধ্যে বাসনা ছিল। এই কথা শুনে বেতাল খুশি হল। কারণ রাজা ঠিকই উত্তর দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজার কাঁধ থেকে নেমে বেতাল সোজা গাছে গিয়ে উঠল। রাজাও ছুটে গিয়ে বেতালকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে চলতে শুরু করলেন। বেতাল এবার তার অষ্টাদশ গল্প বলতে শুরু করল।

banglainternet.com

অষ্টাদশ গল্প

হরিদত্তের পিণ্ডদান

সেকালে কুবলয় পুরে ধনপতি নামে একজন ধনী বণিক ছিল। ধনবতী নামে তার একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। ধনপতি তার মেয়েকে বণিক-পুত্র গৌরীদত্তের সাথে বিয়ে দেয়। বিয়ের কয়েক বছর পর ওদের একটি মেয়ে হয়। মেয়ের নাম রাখা হয় মোহিনী। গৌরীদত্তের মৃত্যু হলে আত্মীয়-স্বজনরা ধনবতীর কাছ থেকে সমস্ত ধনসম্পত্তি কেড়ে নেয়। নিরুপায় ধনবতী এক অমাবস্যার রাতে মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়িতে রওনা দেয়।

অন্ধকারে পথ চলতে গিয়ে ধনবতী ভুল পথে এক শ্মশানে গিয়ে হাজির হল। সেখানে এক চোর রাজার আদেশমতো শূলে চড়ে ছিল। তখনও সে বেঁচে আছে। অন্ধকারে ধনবতীর সঙ্গে চোরের ধাক্কা লাগে। চোর করুণ স্বরে বলল এত কষ্টের মধ্যেও আবার কষ্ট দিলে? কে তুমি?

এই কথা শুনে ধনবতী বলল—আমি জেনেশুনে তোমাকে কষ্ট দিইনি। এই অন্ধকারে তোমাকে দেখতে পাইনি। আমাকে ক্ষমা কর। তা তুমি কেন এই অন্ধকার রাতে এত কষ্ট পাচ্ছ?

চোর বলল—আমি জাতিতে বণিক। চুরির অপরাধে রাজা আমাকে শূলে দিয়েছেন। তিনদিন ধরে শূলে চড়ে আছি, তবুও মরছি না। এক জ্যোতিষি আমাকে বলেছিল অবিবাহিত অবস্থায় আমার মৃত্যু হবে না। আমি যে এই নরক যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না। একমাত্র তুমিই পার আমাকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে। তুমি যদি তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দাও, তাহলেই আমি মুক্তি পাব। আমার অনেক ধন সম্পত্তি আছে সব তোমার মেয়েই পাবে।

চোরের এইসব কথা শুনে ধনবতী রাজী হয়ে মেয়েকে চোরের সাথে বিয়ে দিল। তবে ধনবতী চোরকে বলল—বিয়ে হলেই তুমি মারা যাবে, কিন্তু আমার নাতি হবে কেমন করে?

চোরটা কাতর স্বরে বলল—আমি অনুমতি দিয়ে যাচ্ছি—তোমার মেয়ে বড় হলে তাকে কোন ব্রাহ্মণের সাথে বিয়ে দিয়ে দেবে। তাহলেই তুমি নাতি-নাতনির মুখ দেখতে পাবে। আর শোন, ওই যে দূরে গ্রামটা দেখছ সেখানে আমার বাড়ি। বাড়ির পূর্বদিকে কুয়োর কাছে একটা বটগাছ আছে। তার নিচে আমার সমস্ত ধনরত্ন আছে। তুমি সেগুলো নিয়ে নাও। এই কথাগুলো বলেই চোরটি মারা গেল।

ধনবতী চোরের কথামতো বটগাছের নিচ থেকে সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে বাপের বাড়িতে গেল। সেখানে সুখে তাদের দিন কাটতে লাগল।

দেখতে দেখতে মোহিনী বড় হল। একদিন জানলা দিয়ে এক ব্রাহ্মণকুমারকে দেখে তার খুবই পছন্দ হল। মোহিনী সখীকে দিয়ে ব্রাহ্মণকুমারকে ডেকে মার কাছে নিয়ে গেল। সেখানে ব্রাহ্মণের থাকার ব্যবস্থা করল। তারপর ধনবতী ঐ ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে তার মেয়ে মোহিনীর বিয়ে দিলেন। কিছুদিন পর ওদের এক পুত্র সন্তান হল। মোহিনী একদিন স্বপ্ন দেখল মহাদেব ওকে বলছেন—তোমার সন্তানকে এক হাজার মোহরের সাথে একটা প্যাটরায় ভরে রাজপ্রাসাদের সদর দরজার সামনে রেখে এস। কারণ অপুত্রক রাজা তোমার সন্তানকে নিজের সন্তানের মত মানুষ করবে। তাছাড়া ভবিষ্যতে তোমার ছেলেই রাজা হবে। স্বপ্ন দেখে বাবা-মাকে বলল। তারপর ছেলেকে প্যাটরায় ভরে এক হাজার মোহর দিয়ে রাজপ্রাসাদের সদর দরজায় রেখে এল।

এদিকে রাজাও এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন এক দিব্য পুরুষ তাকে বলছেন, মহারাজ এক শিশু তোমার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছে। দেরী না করে তাকে গ্রহণ কর ও নিজের সন্তানের মতো মানুষ কর। ভবিষ্যতে সেই হবে রাজা। এই স্বপ্ন দেখে রাজার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি রানীকে সব কথা বললেন। তারপর রাজা ও রানী দুইজনে মিলে প্রাসাদের বাইরে এসে দেখেন সত্যিই স্বপ্নের কথা সবই মিলে যাচ্ছে। একটা প্যাটরায় একটি শিশু শুয়ে আছে আর তার গায়ে চারদিক থেকে আলোর জ্যোতি বের হচ্ছে। রানী খুশি হয়ে শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন। রাজা এক হাজার মোহর নিয়ে প্রাসাদে ঢুকলেন। তিনি পণ্ডিতদের ডেকে ছেলেকে দেখালেন। তারা সবাই বললেন এ ছেলে সত্যিই রাজার যোগ্য উত্তরাধিকারী। এই শিশু একদিন পৃথিবীর অধিশ্বর হবে। সেই ছেলের নাম রাখা হলো হরিদত্ত।

সত্যিই তাই হল। হরিদত্ত সমস্ত বিদ্যায় দক্ষ হয়ে উঠল। রাজার মৃত্যুর পর হরিদত্ত রাজা হলেন।

কিছুদিন পর হরিদত্ত তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে শেষে গয়ায় এসে ফল্গু নদীর তীরে শ্রাদ্ধ করে পিণ্ডদানে বসলেন। হরিদত্ত যখন পিণ্ডদানে বসলেন তখন জল থেকে তিনটি ডান হাত উঠে এল। একটি চোরের, একটি ব্রাহ্মণের আর তৃতীয়টি রাজার।

এতখানি বলে বেতাল বলল, বলতো মহারাজ এই তিনজনের মধ্যে কে হরিদত্তের পিণ্ড পাবার অধিকারী? শাস্ত্র ও যুক্তি দিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

রাজা বললেন চোরের। রাজা তাকে পালন করার জন্যে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছিলেন। কিন্তু চোর তার ছেলের জন্যে সবকিছু দিয়ে গিয়েছিল আর মোহিনীর মা তাকে কথা দিয়েছিল ছেলে তারই হবে। বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে ফের গাছে গিয়ে উঠল। আর রাজা বিক্রমাদিত্য তার পিছন পিছন গিয়ে বেতালকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে চাপিয়ে ফের পথ চলতে লাগলেন।

এবার বেতাল তার উনবিংশ গল্প বলতে শুরু করল।

banglainternet.com

ঊনবিংশ গল্প

বলিদান

বহু যুগ আগে চিত্রকূট নগরে রূপদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়ে হরিণ শিকার করতে বের হলেন। হরিণের আশায় বনে বনে ঘুরলেন কিন্তু একটা হরিণও দেখতে পেলেন না। হরিণ না পেয়ে রাজা ক্লান্ত হয়ে এক ঋষির আশ্রমে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে দেখলেন একটা সুন্দর সরোবর, তাতে নীল জল টলটল করছে, অনেক পদ্ম ফুল ফুটে রয়েছে। মৌমাছিরা গুণগুণ করে গান গাইছে আর ফুলে ফুলে মধু খাচ্ছে। পাখিরা সব গাছের ডালে বসে গান গাইছে। রাজা এই সব দৃশ্য অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন।

সেই সময় এক অপূর্ব সুন্দরী ঋষিকন্যা আশ্রম থেকে বেরিয়ে সরোবরে স্নান করতে লাগল। রাজা এই ঋষিকন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ঋষিকন্যা যখন স্নান সেরে আশ্রমের দিকে গেল তখন রাজা তার সামনে গিয়ে বললেন, আমি একজন ক্লান্ত অতিথি।

সেই সময় ঋষিও ফলমূল, কুশ, মধু সব সংগ্রহ করে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাজা তাকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। ঋষি আশীর্বাদ করে বললেন, তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ হোক।

রাজা আশীর্বাদ পেয়ে বললেন এতদিন শুনেছি ঋষিবাক্য কখনও মিথ্যে হয় না। কিন্তু আপনি যা আশীর্বাদ করলেন তা মনে হচ্ছে পূরণ হবে না।

ঋষি ফের বললেন—নিশ্চয় আমার কথা সত্য হবে। রাজা হাতজোড় করে বললেন—আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। আমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন প্রভু।

ঋষি রাজার এই অনুরোধে মোটেই খুশি হলেন না। কিন্তু তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে মেয়েকে রাজার সঙ্গে বিয়ে দিলেন।

রাজা রানীকে নিয়ে রাজধানীতে রওনা দিলেন। পথ চলতে চলতে রাত হয়ে গেল। রাজা ও রানী ফলমূল খেয়ে গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝরাতে এক রাক্ষস এসে রাজাকে জাগিয়ে বলল—আমার খুব খিদে পেয়েছে। আমি তোমার স্ত্রীর নরম মাংস খাব। এই কথা শুনে রাজা বললেন তুমি আমার স্ত্রীকে না খেয়ে অন্য যা চাইবে তাই দেব।

রাক্ষস বলল, তুমি যদি বার বছর বয়সের ব্রাহ্মণ-পুত্রের মাথা কেটে আমাকে এনে দিতে পার, তবেই তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দেব।

রাজা রাক্ষসের কথাতে রাজী হয়ে গেলেন। তিনি বললেন সাতদিন পর আমার রাজধানীতে এলে মাথা তোমাকে দেব। রাজা রানীকে নিয়ে রাজধানীতে পৌঁছলেন। মন্ত্রীকে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। মন্ত্রী সব শুনে বললেন, কোন কিছু ভাববেন না মহারাজ, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

মন্ত্রীর উত্তর শুনে রাজা মনে মনে নিশ্চিন্ত হলেন।

এদিকে মন্ত্রী এক স্বর্ণকারকে দিয়ে একটা মানুষের সমান সোনার মূর্তি তৈরি করল। তাতে দামী দামী গয়না পরিয়ে রাজধানীর চারদিকে ঘুরিয়ে ঘোষণা করলেন, যে ব্রাহ্মণ তার বার বছরের ছেলেকে বলিদান দেবেন তিনি এই মূল্যবান মূর্তিটি পাবেন।

এই রাজ্যে এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিল। দুইবেলা তাদের খাওয়া জুটতো না। ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে বললেন, আমাদের ছেলেটাকে যদি রাজাকে দিয়ে দিই, তাহলে আর অভাব থাকবে না। আবার না হয় একটা ছেলে হবে। স্ত্রী ব্রাহ্মণের কথায় রাজী হলেন। ওরা ছেলেটাকে রাজার হাতে দিয়ে মূর্তিটা পেল সেটা বিক্রি করে ব্রাহ্মণ প্রচুর টাকা পেল।

রাজা ব্রাহ্মণ-ছেলে পেয়ে খুব খুশি হলেন। আর কোন ভয় নেই। সাতদিন পর রাক্ষস এসে হাজির হল। ব্রাহ্মণপুত্র ও খড়্গ নিয়ে মন্ত্রী হাজির হল। ব্রাহ্মণপুত্র বলির পূর্বমুহূর্তে একটু হাসল। রাজা ওর মাথাটা খড়্গ দিয়ে কেটে ফেললেন।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, বলতো মহারাজ ব্রাহ্মণ-পুত্র কেন হেসেছিল? সবাই তো মৃত্যুর ভয়ে কাঁদে, কেউ হাসে না।

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন নিশ্চয় হাসে। কারণ বাল্যকালে সন্তানদের রক্ষা করে তার পিতামাতা। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ-পুত্রের বাবা-মা নিজেদের সুখের জন্যে ছেলেকে বলি দিতে রাজার হাতে তুলে দিয়েছে। আর রাজার কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের রক্ষা করা। এখানে রাজা নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করতে এক নিরপরাধ বালককে নিজের হাতে হত্যা করলেন। ছেলেটি তার জন্যেই হেসেছে।

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে গাছে গিয়ে ঝুলে রইল। রাজা বিক্রমাদিত্য তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। এবার বেতাল তার বিংশ গল্প বলতে শুরু করল।

amarinternet.com

অকাল মৃত্যু

সেকালে বিশালপুর রাজ্যে অর্থদত্ত নামে এক ধনী বণিক বাস করতো। তার একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। মেয়েটির নাম ছিল অনঙ্গমঞ্জরী। অর্থদত্ত তার মেয়েকে কমলপুরবাসী মদনদাস নামের এক বণিকের সাথে বিয়ে দিল। বিয়ের কিছুদিন পর মদনদাস অনঙ্গমঞ্জরীকে তার বাপের বাড়িতে রেখে বাণিজ্য করতে গেল।

অনঙ্গমঞ্জরী মনমরা হয়ে একদিন জানলায় দাঁড়িয়ে মানুষজন দেখছিল। হঠাৎই দেখতে পেল এক সুন্দর সুপুরুষ ব্রাহ্মণপুত্রকে। তাকে দেখে অনঙ্গমঞ্জরী মুগ্ধ হয়ে গেল। ওদিকে ব্রাহ্মণকুমার কমলাকরও অনঙ্গমঞ্জরীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। একবার দেখাতেই ওরা দুইজন দুইজনকে ভালবেসে ফেলল। অনঙ্গমঞ্জরী তো কমলাকরের কথা ভেবে ভেবে বিছানায় শয্যা নিল। তেমনি ব্রাহ্মণপুত্র কমলাকরও অনঙ্গমঞ্জরীর কথা ভেবে ভেবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। অনেক চিকিৎসা সত্ত্বেও অনঙ্গমঞ্জরী ভাল হল না। তার সখী ঠিক করল, অনঙ্গমঞ্জরীকে বাঁচাতে হলে কমলাকরকে ওর কাছে নিয়ে আসতে হবে। তাই সখী কমলাকরের বাড়িতে গিয়ে সব কথা বলে তাকে অনঙ্গমঞ্জরীর সঙ্গে দেখা করতে বলল।

সব কথা শুনে কমলাকর অনঙ্গমঞ্জরীর সাথে দেখা করতে এল। কিন্তু ততক্ষণে অনঙ্গমঞ্জরী মারা গেছে। কমলাকর এই কথা জেনে মাটিতে বসে পড়ে মরে গেল। সবাই ওদের দুইজনকে একই চিতায় দাহ করল। ঠিক সেই সময় মদনদাসও এসে হাজির হল। স্ত্রী মারা গেছে জেনে সেও জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে মরে গেল।

এবার বেতাল গল্প শেষ করে বলল, বলতো মহারাজ কার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালবাসা ছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন মদনদাসের; কারণ অনঙ্গমঞ্জরী পরপুরুষের জন্যে প্রাণ ত্যাগ করল। তেমনি কমলাকরও পরস্ত্রীর জন্যে প্রাণ দিল। আর মদনদাস সব কথা জেনেও স্ত্রীর জন্যে প্রাণ দিল। এতে বোঝা যায় মদনদাস স্ত্রীকে কতখানি ভালবাসতো।

সঠিক উত্তর শুনে বেতাল সেই গাছে গিয়ে আবার ঝুলে পড়ল। আর রাজাও গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। এবার বেতাল তার একবিংশ গল্প বলতে শুরু করল।

বোকামির পরিণাম

অনেক দিন পূর্বে জয়স্থল রাজ্যে বিষ্ণুস্বামী নামে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তার চার ছেলে ছিল। বড় ছেলেটা ছিল জুয়াড়ী, মেজটি ছিল চরিত্রহীন, সেজটি ছিল নির্লজ্জ আর ছোটটা ছিল নাস্তিক। চার ছেলের এই রকম অবস্থায় বাবা-মা দুইজনেই মারা গেল। ছেলেদের কোন অভিভাবক না থাকায় আত্মীয়-স্বজনরা ওদের সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিল। চার ভাই এই অবস্থায় খুবই বিপদে পড়ল। তারা ঠিক করল আর এখানে থেকে কি হবে? তার চেয়ে মামাবাড়িতে গিয়ে থাকা অনেক ভাল। দিদিমা দাদু না থাকলেও মামারা তো আছে, তারা নিশ্চয় ফেলে দেবে না। এই সব ভেবে-চিন্তে চার ভাই মামাবাড়িতে গিয়ে উঠল।

মামারা কি আর করে। ভাগ্নেদের থাকতে দিল। চার ভাই মামাবাড়িতে থেকে বেদ পাঠ করতে লাগল। বেশ কিছুদিন পর চার ভাই বুঝল তাদের থাকাটা মামারা মোটেই ভাল চোখে দেখছে না। এই রকম অবস্থায় একদিন বড় ভাই অন্য ভাইদের ডেকে বলল—এখানে আমাদের আর থাকা উচিত নয়। আমরা সবাই মনে মনে দুঃখ পাচ্ছি। একদিন মনের দুঃখে আমি শ্মশানে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি একটি মরা মানুষ হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে। এই মরা মানুষটাকে দেখে আমার খুব হিংসে হল। ভাবলাম, এই লোকটাই সবচেয়ে সুখী। ওর কোন দুঃখ-কষ্ট-চিন্তা-ভাবনা নেই। আমি ভাবলাম, আমিও মরে যাই, তাহলে আমিও শান্তি পাব। আর দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। গাছে দড়ি বেঁধে গলায় দড়ি দিতে গেলাম। তাতেও আমার মরণ হল না। দড়ি ছিঁড়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি একজন দয়ালু মানুষ তার কোলে আমার মাথাটা নিয়ে হাওয়া করছেন। আমি তাকাতেই উনি বললেন তুমি বুদ্ধিমান হয়ে এ কাজ কেন করতে গেলে? এই পৃথিবীতে সুখ-দুঃখ হচ্ছে সবই ভাল আর মন্দ কর্মের ফল। তাহলে উচিত ভাল কাজ করা। তাতেই সুখ মিলবে। আত্মহত্যা করা মহাপাপ। এতে নরকে যেতে হয়। এইসব কথা বলে লোকটা চলে গেলেন। আর আমিও বাড়িতে ফিরে এলাম। তাহলে বুঝতেই পারছ ভাগ্যে লেখা না থাকলে আত্মহত্যাও করা যায় না। তাই আমি ভাবছি কোন তীর্থস্থানে গিয়ে তপস্যা করবো ও সেখানেই দেহ রাখবো। তাহলে পরজন্মে আর এই অভাব ও দুঃখ-কষ্ট থাকবে না।

বড় ভাইয়ের কথা শুনে তিন ভাই বলল, দাদা অর্থের জন্যে এত ভেঙে পড়ছেন কেন? ধনদৌলতের কি কোন স্থিরতা আছে? ধনসম্পদ কেউ চিরকাল ধরে রাখতে পারে

banglainternet.com

না। তার চেয়ে আমরা এই পৃথিবীর সব জায়গা ঘুরে ঘুরে এমন সব গুণ অর্জন করবো যাতে লক্ষ্মীকে ঘরে বেঁধে রাখতে পারি।

ছোট ভাইদের কথায় বড় ভাই রাজী হয়ে গেল। তারপর চার ভাই মিলে ঠিক করল ওরা সবাই দিব্য বিদ্যা লাভ করে এক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দেখা করবে। চার ভাই পৃথিবীর চার প্রান্তে গেল দিব্য বিদ্যা অর্জন করতে। দিব্য বিদ্যা লাভ করে সেই নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে চারজনের দেখা হল।

চার ভাই তাদের দিব্য বিদ্যার কথা বলতে লাগল। একজন বলল, সে মৃত জীবের হাড় পেলে তাতে দিব্য বিদ্যার জোরে মাংস বসিয়ে দিতে পারে। দ্বিতীয় জন বলল, সে তাতে চামড়া ও লোম বসিয়ে দিতে পারে। তৃতীয় জন বলল, সে সব অঙ্গ তৈরি করে দিতে পারে। চতুর্থ জন বলল, সে মৃত জীবের দেহে প্রাণ দিতে পারে। চার ভাইই তাদের দিব্য-বিদ্যার পরীক্ষা দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রথমে শুরু হল মৃতের হাড় খোঁজা। খুঁজতে খুঁজতে ওরা এক বনের মধ্যে সিংহের কয়েকটি হাড় পেল। হাড়গুলো পেয়েই চার ভাই মিলে নিজেদের দিব্য বিদ্যা দেখাতে শুরু করল। প্রথম ভাই সিংহের হাড়ে মাংস লাগাল, দ্বিতীয় ভাই তাতে চামড়া ও লোম লাগাল। তৃতীয় ভাই সেটার সম্পূর্ণরূপ দিল আর চতুর্থ ভাই তাতে প্রাণ দান করল। ব্যস, মৃত সিংহ জীবিত হয়ে চার ভাইকে মেরে বনের ভিতর চলে গেল। ভাগ্য খারাপ হলে কোন বিদ্যাই সুফল দেয় না। বরং ক্ষতি করে।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, বলতো মহারাজ চার ভাইয়ের সৃষ্ট সিংহ যে তাদের মেরে ফেলল, এর জন্যে বেশি দায়ী কে?

এই প্রশ্নে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন এর জন্যে বেশি দায়ী হচ্ছে সেই ভাই, যে সিংহের প্রাণ দান করল। অন্য তিন ভাই তো শুধু তাদের বিদ্যার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু শেষের জন যখন দেখল এটা সিংহ, তখন তাকে প্রাণ দিতে গেল কেন? সে বোকার মতো কাজ করেছে। যার ফলে চার ভাইকেই সিংহের হাতে প্রাণ দিতে হল।

রাজার সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল পুনরায় গাছে গিয়ে চড়ল। আর রাজাও তার পিছু পিছু গিয়ে তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। এবার বেতাল তার দ্বাবিংশ গল্প বলতে শুরু করল।

দ্বাবিংশ গল্প

ইচ্ছাপূরণ

বিশ্বপুর নগরে নারায়ণ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। বুড়ো হয়ে ব্রাহ্মণের দেহ দুর্বল হয়ে গেল। সে ভাবল যৌবনে ভোগবিলাসের উপর কোন মোহ ছিল না। কিন্তু এখন আমার ভোগবিলাসের প্রতি খুব লোভ হচ্ছে। আমিতো পর দেহ-ধারণ বিদ্যা জানি। সেই বিদ্যার জোরে আমিতো এখনই যুবক হতে পারি। ইচ্ছেমতো সুখভোগ করতে পারি। কিন্তু এই ইচ্ছাপূরণ করতে হলে আমাকে বনে যেতে হবে।

সংসারের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নারায়ণ বনে চলে গেল। স্ত্রী পুত্রদের বলল, জীবনের শেষ সময়টুকু বনেই ধ্যান জপ করে কাটাব। তাই বনে চলে যাচ্ছি। ব্রাহ্মণ নারায়ণ বনে গিয়ে নিজের দেহ ত্যাগ করে এক যুবকে পরিণত হল। ইচ্ছেমতো সুখভোগ করতে লাগল। এতখানি বলে বেতাল বলল, মহারাজ এই ব্রাহ্মণ দেহ ত্যাগ করার সময় কেঁদেছিল, আবার অন্য দেহ ধারণ করে হেসেছিল। বলুন তো এই ব্রাহ্মণ প্রথমে কেন কাঁদলেন আর পরেই বা কেন হাসলেন?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন ব্রাহ্মণ দেহ ত্যাগ করার সময় কেঁদেছিল কারণ তার স্ত্রীপুত্রদের ছেড়ে যাচ্ছে আর এদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না। এই দুঃখে কেঁদেছিল। আর দ্বিতীয় কারণ যৌবন-দেহ লাভ করে মনের আনন্দে হেসেছিল, কারণ নিজের ইচ্ছাপূরণ করতে পারবে বলে।

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে সেই শিরীষ গাছে গিয়ে উঠল। আর রাজা তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন। এবার বেতাল তার ত্রয়োবিংশ গল্প বলতে শুরু করল।

banglainternet.com

ত্রয়োবিংশ গল্প

ভোজনবিলাসী শয্যাবিলাসী

পুরাকালে ধর্মপুরে গোবিন্দ নামের এক ব্রাহ্মণের দুই ছেলে ছিল। দুই ছেলের মধ্যে একজন ছিল খুবই ভোজনবিলাসী। রান্না খারাপ হলে তার মুখে উঠত না। আর দ্বিতীয় ছেলেটি ছিল শয্যাবিলাসী। আরামদায়ক শয্যা ছাড়া তার ঘুম হতো না।

এই খবর রাজার কানে গেল। তিনি দুই ভাইকে ডেকে পাঠালেন ও বললেন তোমরা কে কোন বিষয়ে বিলাসী? দুই ভাইই তাদের নিজ নিজ পরিচয় দিল। ভোজনবিলাসীকে পরীক্ষা করার জন্যে রাজা পাচক ডেকে ভাল ভাল খাবার রান্না করতে বললেন। রাজার আদেশমত পাচক নানা রকমের খাবার রান্না করল।

রাজা ভোজনবিলাসীকে আহার করতে বললেন। আহার শেষে রাজা বললেন, ভালমত খেয়েছোতো?

ভোজনবিলাসী বলল, না মহারাজ আহার আমার হয়নি। কারণ, ভাতে শবগন্ধ রয়েছে। আমার মনে হয় শ্মশানের কাছের কোন ক্ষেতের ধান থেকে এই চাল হয়েছে। তাই ভাতে এমন শবগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

রাজা এই কথা শুনে মনে মনে হাসলেন আর ভাবলেন এই ছেলেটি নিশ্চিত পাগল। তবে উনি গোপনে খবর নিলেন সত্যিই ধানটা শ্মশানের কাছের কোন ক্ষেতে হয়েছে কিনা। জানা গেল সত্যিই শ্মশানের পাশের ক্ষেতের ধান থেকে এই ভাত হয়েছে।

এই খবর শুনে রাজা ভোজনবিলাসীকে তারিফ করলেন আর বললেন সত্যিই তুমি ভোজনবিলাসী।

এবার রাজামশায় শয্যাবিলাসীকে এক সুসজ্জিত শয্যায় শুতে দিলেন। শয্যাবিলাসীও অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজার কাছে ফিরে এসে বলল মহারাজ আমার আর শোয়া হবে না। কারণ এই শয্যার সপ্তমতলে একটা চুল আছে তাতে আমার অসুবিধে হচ্ছে। তাই উঠে এসেছি।

রাজা এই কথায় খুবই অবাক হয়ে গেলেন। তিনি শয্যাঘরে ঢুকে বিছানায় সপ্তম তলে সত্যিই একটা চুল পেলেন। রাজা খুবই খুশি হলেন। তিনি বললেন, সত্যিই তুমি শয্যাবিলাসী। রাজা খুশি হয়ে দুই ভাইকে প্রচুর পুরস্কার দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, বলুন তো মহারাজ, এই দুই ভাইয়ের মধ্যে কে বেশি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার মতে শয্যাবিলাসী।

রাজার সঠিক উত্তর শুনে বেতাল আর দেরী না করে গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল। রাজা তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। এবার বেতাল তার চর্তুবিংশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।

banglainternet.com

হাসি-কান্না

অনেক যুগ পূর্বে কলিঙ্গ দেশে যজ্ঞশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করত। তার কোন সন্তান ছিল না। দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করে সে একটি পুত্র লাভ করে। ব্রাহ্মণের ছেলেটা অল্প বয়সেই সর্ব শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠল। ছেলেটি বাবা-মার খুব সেবা করত। এই সেবা করাটা তার কাছে ছিল ধর্ম পালন। ছেলেটি হঠাৎ মাত্র আঠারো বছর বয়সে মারা যায়। ছেলের মৃত্যুতে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী খুবই ভেঙে পড়ল। তারা খুব কান্নাকাটি করতে লাগল। অবশেষে মৃতদেহ সৎকারের জন্যে চিতা সাজানো হল।

এক বৃদ্ধ যোগী বহুদিন ধরে এই শ্মশানে যোগাভ্যাস করছিলেন। তিনি এই আঠারো বছরের ব্রাহ্মণপুত্রকে দেখে ভাবলেন আমার এই দুর্বল দেহ দিয়ে আর কোন কাজই হচ্ছে না। আমি যদি এখন এই ব্রাহ্মণ ছেলেটির দেহে প্রবেশ করি তাহলে বহুদিন যোগাভ্যাস করতে পারব। এই কথা ভেবেই বৃদ্ধ যোগী যোগ বলে ব্রাহ্মণ পুত্রের দেহে ঢুকে পড়লো। যেই ঢোকা অমনি ব্রাহ্মণ পুত্র তার প্রাণ ফিরে পেল। যজ্ঞশর্মা ছেলেকে ফিরে পেয়ে আনন্দে হাসতে লাগলেন; আবার কিছুক্ষণ পরেই কাঁদতে লাগলেন।

বেতাল তার গল্প শেষ করে বলল, বলতো মহারাজ ব্রাহ্মণ তার ছেলেকে ফিরে পেয়ে প্রথমে হাসলেন কেন? আর পরে কাঁদলেনই বা কেন?

রাজা বললেন, ছেলেকে ফেরত পেয়ে ব্রাহ্মণের মনে আনন্দ হয়েছে। তাই তিনি প্রথমে হেসেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ পরদেহ-প্রবেশনী বিদ্যাটা জানতো। তাই সে বুঝতে পেরেছে তার ছেলে মোটেই পুনর্জীবন লাভ করেনি। যোগী তার যোগ সাধনা দিয়ে ছেলেকে বাঁচিয়েছেন মাত্র। এজন্য ব্রাহ্মণ কেঁদেছে।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল গাছে গিয়ে ঝুলে রইল। রাজা বিক্রমাদিত্য বেতালকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে চাপিয়ে পথ চলতে লাগলেন। এবার বেতাল তার পঞ্চবিংশ গল্প বলতে শুরু করল।

বিক্রমাদিত্যের জয়-জয়কার

বহুকাল পূর্বে দাক্ষিণাত্যে ধর্মপুর নামে এক রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন মহাবল। একদিন অন্য রাজ্যের এক রাজা প্রচুর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মহাবলের রাজ্য আক্রমণ করলেন। রাজা মহাবলও তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধে নামলেন। কিন্তু অল্পক্ষণেই সমস্ত সৈন্য শত্রুপক্ষের হাতে মারা গেল। রাজা মহাবল নিরুপায় হয়ে রানী ও রাজকন্যাকে নিয়ে গভীর বনে পালিয়ে গেলেন।

অনেক পথ হেঁটে রাজা-রানী আর রাজকন্যা ক্ষিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠল। রাজা ওদের একটা গাছতলায় বসিয়ে খাবারের খোঁজে গেলেন। এদিকে গভীর বনে দিনের আলো নিভে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল। রাজা ফিরছেন না দেখে রানী ও রাজকন্যা নানা অমঙ্গলের কথা ভেবে অস্থির হয়ে উঠল।

এদিকে সেদিন কুণ্ডিনের রাজা চন্দ্রসেন তার বড় ছেলেকে নিয়ে মৃগয়া করতে বনে ঢুকেছিলেন। পথে মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখে খুবই অবাক হলেন। রাজা ভাবলেন এই পায়ের চিহ্ন কি কোন পুরুষের না নারীর! রাজা বুঝলেন কিছুক্ষণ আগেই এই পথ দিয়ে মানুষ গেছে। তাই তিনি খুঁজতে লাগলেন। রাজা ও রাজপুত্র দুইজনে মিলেই খুঁজতে লাগলেন। দেখতে পেলেন একটা গাছের নিচে দুইজন নারী বসে বসে কাঁদছে। রাজকুমার আর রাজা দুইজনে মিলে তাদের বুঝিয়ে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন।

বেশ কিছুদিন পর রাজা রাজকন্যাকে আর রাজকুমার রানীকে বিয়ে করলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, বলতো রাজা এই দুইজনের যখন সন্তান হবে, তখন তাদের মধ্যে কি সম্বন্ধ হবে?

বেতালের এই প্রশ্নে রাজা বিক্রমাদিত্যর ঠিক উত্তরটা মনে এল না। তিনি কোন কথা না বলে পথ চলতে লাগলেন। বেতাল বুঝল এবার সে জিতেছে। তবে মনে মনে ঠিক করল এই বীর সাহসী রাজাকে ঠকাবে না। যে ভণ্ড সন্ন্যাসী দিব্যপদ পাবার লোভে এই রাজাকে এত হয়রান করাচ্ছে, তাকেই শাস্তি দিতে হবে। তার দিব্য এই রাজাকেই দিতে হবে। বেতাল রাজাকে বলল আচ্ছা মহারাজ, তুমি এই শ্মশানে এতবার আসা-যাওয়া করলে, অথচ তোমাকে কখনো বিরক্ত হতে দেখিনি। তাই আমি তোমার উপর খুব খুশি হয়েছি। এবার যা বলছি, সব মন দিয়ে শোন। যক্ষ তোমাকে যে রাজা চন্দ্রভানুর কথা বলেছে, এই মৃতদেহ, মানে এখন যেটা তুমি কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছ,

banglainternet.com

সেটা তারই। আমি এখনই শব ছেড়ে যাচ্ছি, তুমি এই শবটা সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যাও। ওই ভণ্ড সন্ন্যাসীটা এই শব পেলেই আমাকে আনার জন্যে পুজো করবে। ঠিক তখনই সন্ন্যাসী তোমাকে এই শবের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে বলবে। তুমি কিন্তু মোটেই প্রণাম করবে না। তুমি বলবে আমি কোনদিন কাউকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিনি। তাছাড়া কি করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয় তা আমি জানি না। একবার আমাকে দেখিয়ে দিলেই পারবো। তোমার কথা শুনে সন্ন্যাসী যেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে দেখাবে, তখনই খড়্গ দিয়ে সন্ন্যাসীর মাথাটা কেটে ফেলবে। তাহলে তুমিই সমস্ত বিদ্যা লাভ করবে এবং বিদ্যাধরদের রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়ে রাজত্ব করবে। শোন মহারাজ, আমি যা বলছি তেমনটি কর, নইলে তোমাকেই ও বলি দেবে। আমি এখন শব থেকে চলে যাচ্ছি। তুমি এই শবকে নিয়ে সন্ন্যাসীর কাছে যাও। এই কথা বলে বেতাল ব্রাহ্মণের শব ছেড়ে চলে গেল। বেতালের কাছ থেকে সব শুনে রাজা বুঝতে পারলেন এই সন্ন্যাসী শান্তশীল, ওর শত্রু। তবুও রাজা বিক্রমাদিত্য শবটাকে কাঁধে করে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে হাজির হল।

সন্ন্যাসী শান্তশীল ভয়ঙ্কর অন্ধকারে শ্মশানে অপেক্ষা করছিল। সে মরা মানুষের চর্বি দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। বলির জন্যে সব আয়োজন করা আছে। সন্ন্যাসী বিক্রমাদিত্যের কাঁধে শব দেখে খুব খুশি হল। মহারাজার প্রশংসা করে সে বলল, আপনি আমার যে উপকার করলেন তা কেউই করতে পারত না। আপনার মতো পরপোকারী আর কেউ নেই। এইসব মিষ্টি কথা বলে সন্ন্যাসী রাজার কাঁধ থেকে শবটা নিচে নামিয়ে তাকে স্নান করিয়ে, নিজে মৃতের কাপড় চোপড় পরে একমনে ধ্যান করতে লাগল। বেতালকে ধ্যানযোগে আরাধনা করল। তারপর রাজাকে বলল, মহারাজ বেতাল এসে গেছেন। এবার আপনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করুন, তাহলে আপনি বর পাবেন।

সন্ন্যাসীর মুখে এই কথা শুনে বেতালের কথাগুলো রাজার মনে পড়ল। তখন তিনি সন্ন্যাসীকে বললেন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কিভাবে করতে হয়, তা আমি জানি না। দয়া করে আমাকে দেখিয়ে দিন। একবার দেখিয়ে দিলে তা আমি করতে পারবো।

রাজার কথা শুনে সন্ন্যাসী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম দেখাতে মাটিতে হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। রাজা বিক্রমাদিত্য সঙ্গে সঙ্গে এককোপে সন্ন্যাসীর মাথা কেটে ফেলল।

সন্ন্যাসীর মাথা কাটতেই শ্মশানের ভূতেরা সব রাজার জয়ধ্বনি করে উঠল। বেতাল রাজাকে বলল তুমি বিদ্যাধরদের রাজপদ পেলে। আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, অনেক হয়রানি করিয়েছি। এবার বল তুমি কি চাও আমার কাছে?

বেতালের কথায় রাজা বললেন, তুমি যে আমার উপর খুশি হয়েছ, এতেই আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে। তবে তুমি যদি আমাকে কিছু বর দিতে চাও তাহলে তুমি এই বর আমাকে দাও, তুমি আমাকে যে পঁচিশটা গল্প শোনালে তা যেন বিখ্যাত হয়ে সুধীজনের কাছে সমাদর পায়।

রাজার এই কথায় বেতাল বলল তথাস্তু, তাই হবে। আর শোন এই পঁচিশটি গল্পের একত্রে নাম হবে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। এই গল্প সবার কাছেই সমাদর পাবে, সম্মান

পাবে। তাছাড়া যে এই গল্পের একটা শ্লোক পড়বে বা শুনবে তার কোন অভিশাপ থাকবে না, সে সব অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। যেখানে এইগুলো পড়া হবে সেখানে কোন যক্ষ, বেতাল, কুষ্মাণ্ড, ডাকিনী বা রাক্ষসের উপদ্রব থাকবে না। এই কথাগুলো বলেই বেতাল শবদেহ ত্যাগ করে তার নিজের জায়গায় চলে গেল।

এবার শিব অন্য দেবতাদের নিয়ে রাজার সামনে হাজির হলেন। শিব বললেন তুমি খুবই ভাল কাজ করেছ। এই রকম একটা ভণ্ড সন্ন্যাসীকে মেরে ফেলেছ। অনেক আগে অসুরদের নিধন করার জন্যে আমারই এক অংশ দিয়ে তোমাকে বিক্রমাদিত্য নামে সৃষ্টি করেছিলাম। সেই তোমাকেই এবার দুষ্কৃতকারীকে হত্যা করার জন্যে আমি ত্রিবিক্রম সেন নাম গ্রহণ করেছি। তুমি দ্বীপাবলী আর পাতালসহ সমগ্র পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবে ও পরে বিদ্যাধরদের রাজচক্রবর্তী হবে। দীর্ঘকাল স্বর্গসুখ পাবার পর তোমার মনে যখন বৈরাগ্য আসবে তখন তুমি আমার সঙ্গে এসে মিলবে। অপরাজিত নামে একটা খড়্গ তোমাকে দিচ্ছি। এটার সাহায্যেই তুমি সব লাভ করবে। এই কথাগুলো বলে শিব রাজাকে খড়্গটা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে রাত শেষ হয়ে গেল। রাজা নিজের রাজ্যে ফিরলেন, নগরবাসীরা সুকাজের জন্যে তাঁকে সংবর্ধনা জানালো। রাজা স্নান সেরে শিব পূজা করলেন। তারপর তিনি শিবের দেওয়া সেই খড়্গের জোরে সমগ্র দ্বীপাবলি ও পাতালসহ পৃথিবীর রাজত্ব করলেন। অবশেষে বিদ্যাধরদের রাজচক্রবর্তী হয়ে স্বর্গে গিয়ে শিবের সঙ্গে মিলিত হলেন।

---

banglainternet.com